সখারাম গণেশ দেউস্কর

ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাসুদেব মোশেল

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৩শে নভেম্বর ১৯৭৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিন্টার্স
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা – ৭০০০০৪

প্রচ্ছদ ঃ
অনাদি মোশেল

রঘুদেব বাটী সাধারণের বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক শ্রীগণেশচন্দ্র রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্য বই :

হৃত্মুমিঞা

নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' থেকেই বন্ধন মুক্তির প্রয়াস ভারতবাসীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। বলাবাহুল্য, পরাধীন ভারতবর্ষে যে সত্য ও সংকল্পটি নাগরিকদের কাছে জরুরী হয়ে উঠেছিল তা হোল ভারতের বন্ধন মুক্তির দৃঢ় সংকল্প। এই মহাসংকল্পের প্রতি আস্থা-জ্ঞাপনের সঙ্গে দেশের নেতৃবৃন্দ মহাসঞ্জীবনী মন্ত্রে জীবনমরণ পণে এগিয়ে গেছেন সংগ্রামের দিকে।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পারশিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহু বিচিত্র মানসিকতার মধ্যে কখনো কখনো ঐক্যের অন্তরায়ে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, ভুল বোঝাবুঝি হ'লেও পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি কামনায় তাঁরা একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁরা একই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, কারাবরণ, অকালে ফাঁসীর মঞ্চে জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি। দেশের মুক্তি কামনায়, দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য তাঁরা হাসিমুখে সব দুঃখকষ্টকে নীরবে সহ্য করেছেন। জাতি, ধর্ম, ভাষার বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অখণ্ডতার মতো জাতীয় ঐক্যকেও তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। বরং তাঁরা হাসিমুখে স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তরাঙা পথে ছুটে গেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ময়দানে, যে রক্তস্নাত ময়দানে জীবন মরণপণে নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ থেকে শুরু করে স্বাধীনতাকামী বহু বিপ্লবীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, বাল গঙ্গাধর টিলক, নেতাজী, ক্ষুদিরাম, সূর্য্য সেন, কানাইলাল, বারীন ঘোষ প্রমুখ বীর সন্তানেরা মহান আত্মত্যাগের গৌরবে সঠিক দায়িত্ব পালনের পন্থা নির্দেশ করে গেছেন। সেই নির্দেশের প্রতি আমরা দেশাত্মবোধকে বাঁচিয়ে রাখার কৃচ্ছসাধন করে যাচ্ছি আজও।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বহু বিস্তৃত। সেই ইতিহাসের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে বহু মনীষীর আত্মত্যাগ, যে আত্মত্যাগের সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজানা। তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা আজকের দিনে বড় বেশী জরুরী হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত বহু মনীষীর অবদান সম্পর্কে আজও যথার্থ মূল্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে না। স্বাধীনতার সিঁড়ি বেয়ে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি কিন্তু আজও ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা তো দূরের কথা বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন ইতিহাস সাধারণের অগোচরে থেকে গেছে। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। বহু মনীষী বিপ্লবীর মধ্যে আমি একজন মাত্র মহান ব্যক্তির কথাই দৃষ্টান্ত রূপে দেবার প্রয়াসী হচ্ছি। বহু গ্রন্থে সেই মনীষীর সম্পর্কে দু'এক ছত্র লেখা হয়েছে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী কয়েক বছর আগে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু আজও ভারতীয় ভাষায় তাঁর অবদান সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান কেউই অস্বীকার করেন নি। অথচ তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে কি সরকার, কি স্বাধীনতা প্রয়াসী জনগণ কেউই তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি।

সখারাম গণেশ দেউস্করের জীবন ও সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে সেকালের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী উদ্বুদ্ধ হয়েছেন—স্বাধিকারের সাধনায়, পরিত্রাণের অভয় মন্ত্রে। যে মন্ত্র তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যে, বাগ্মীতায় জীবনের আচরণে জাতিকে দিয়ে গেছেন তা হোল "নৈতিক সততা ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' একটি প্রেরণা জাগানো গ্রন্থ। সখারাম গণেশ দেউস্কর সম্পর্কে জানার আগ্রহ হয় ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা সম্পাদিত 'দেশের কথা' পাঠ করার পর। সখারাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যিনি সবরকম সহযোগিতা করে উপকৃত করেছেন তিনি হলেন 'বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মাখনলাল কুণ্ডু মহাশয়। এই গ্রন্থ রচনায় আরও দুজন মহৎ ব্যক্তি একজন আকাশবানী কোলকাতা কেন্দ্রের শ্রীযুক্ত অজয় বসু (অজয়দা) অপরজন বঙ্গবাসী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীশান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীযুক্ত কুণ্ডু, বসু ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আর গ্রন্থ-প্রকাশের পশ্চাদে আরও কয়েকজনের মধ্যে ডঃ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য ও কেশব আঢ্য—গ্রন্থটির উৎকর্ষ সাধনে ও ত্রুটি

সংশোধনে তৎপর হয়েছিলেন—এঁদেরকে জানাই মৈত্রীর অভিবাদন-সহ কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থরচনায় ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সংবাদপত্রের যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের কথা লিখেছি তা মূলতঃ সাংবাদিকতা (এম. এ) পাঠ্যক্রমের অনুধাবনে অনুপ্রাণিত হয়ে। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে যাঁদের কাছে সংবাদপত্র ও ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করেছি এবং তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছি সেই গুণী আচার্য শ্রদ্ধেয় সুধাংশুকুমার বসু, সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার দাস, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, নীরোদ ভট্টাচার্য, সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কে. কে. মৈত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও প্রণাম করি।

ক্ষেত্র বিশেষে লেখা ও অন্যান্য বিষয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনার যোগ সূত্র পেয়েছি সেই সমস্ত বাঙলা সাহিত্যের বিদগ্ধজনদের মধ্যে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, ডঃ স্বপন বসু, ডঃ অশোক কুণ্ডু, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র, ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্র, শিশু সাহিত্যিক ইন্দিরা দেবী, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যিনি পুত্রবৎ স্নেহে দীর্ঘদিন ধরে আমার সাহিত্য সাধনার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমার ভালোমন্দের সংবাদে বেশী খুশী হন, সেই সদাহাস্য বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পালকে জানাই আমার প্রণতি।

আমার লেখা পত্রের ব্যাপারে, যারা আমাকে উৎসাহ, ভৎর্সনা ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে উচিত পথে চলার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর পল্লব মিত্র, সুভাষ মৈত্র, বিপ্লব চক্রবর্তী, অধ্যাপক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, লক্ষ্মণ কর্মকার, নীরেন্দু হাজরা এবং শ্রদ্ধেয় অশোক উপাধ্যায়কে জানাই আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

নিজেদের অমূল্য সময় নষ্ট করে এই গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সত্বর পেতে সহযোগিতার দক্ষিণ-হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধুবর নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, সীতারাম মাঝি, অজিত গোস্বামী ও বি কে রায়, তাঁদের ঋণ স্বীকার করি। সেইসঙ্গে আর একজনের কথা না বলে পারছি না। যিনি দিদি

সেজে শুধুমাত্র শাসনই না করে আমার কৃতকর্মে খুশী হয়ে আমার অনেক ছোট বড়ো কাজে সহযোগিতা করে শ্রম লাঘবে আমার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগের গ্রন্থতালিকা ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিয়েছেন, সেই পুতুলদিকে (সুজাতা রায়) আমার প্রীতির অভিনন্দন জানাই।

প্রকাশের গুরু দায়িত্ব বহনে অনুপকুমার মাহিন্দার আগ্রহী না হলে এই গ্রন্থ কোন দিনই ছাপাখানার মুখ দেখতো না। তাই বন্ধুবর অনুপকে ধন্যবাদ না দিয়ে তার অশেষ ঋণের কথাই স্বীকার করি।

বাসুদেব মোশেল

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

মহাপ্রাণ সখারাম গণেশ দেউস্কর ও তাঁর স্বাক্ষর
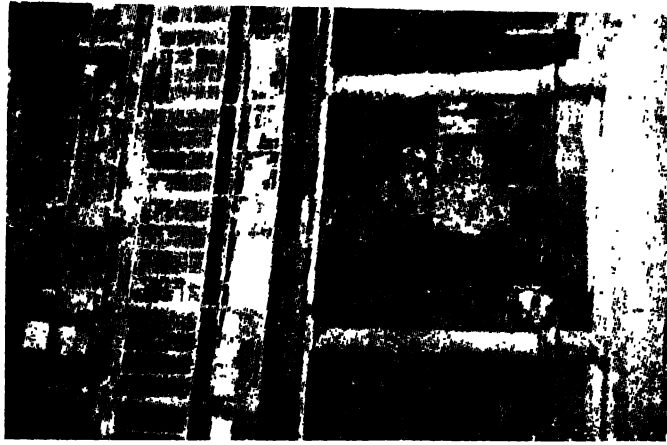
অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রস্থল

৫৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (বিধান সরনী)

ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রাণপুরুষ

শ্রীঅরবিন্দ

১.

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে রাজনৈতিক চেতনার অভিষেককালে মানবতাবাদই ছিল জাগরণের একমাত্র মূলমন্ত্র। পরাধীন ভারত-বর্ষের স্বাধীন চিন্তার উদ্‌ঘোষণ, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতীয় নব জাগরণের আদর্শ নানাভাবে বিস্তৃত হতে থাকে বিভিন্ন গণসংগঠন ও বিভিন্ন গণআন্দোলনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭০ সালের অন্তর্মধ্যে পরাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীন কর্মপ্রয়াসের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা "ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম আধুনিক সর্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবোধ অঙ্কুরিত হয়ে বাংলার বাইরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে।"[১] বোধকরি সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল বাংলাকে কেন্দ্র করে—"What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow" এবং ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের পর্যায়লক্ষ্যে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর Quoted in History of Bengal গ্রন্থে লিখেছেন: "Politics did not involve in those days any sufferings or sacrifices. The Political authorities in the Country did not take our infant political movement seriously. They saw no menace to their authority in it. The whole thing was more or less, a pastime, though certainly the more serious minded of our youthful intellectuals did not consciously purpose it as such.[২]

১ 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ': 'দেশ' [সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪]

২ Quoted in History of Bengal. Edited by Prof. N. K. Sinha p. 173.

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ১৮৬৭ সালে শ্রীনবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার সূচনার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জাতীয় সঙ্গীতে সর্বভারতীয় ঐক্যের জাগরণ প্রতিভাত হয় :

'মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনঃ প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।'

ভারতীয় ঐক্যসাধনে হিন্দুমেলাই সর্বপ্রথম সক্রিয়ভাবে জাতীয়বোধের ঐক্য ঘোষণা করে "এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচরে নাই। একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম সাধন, অনেক উৎসাহবৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যতলোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের এই মিলন—সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ইহা ভারত-ভূমির জন্য"[৩] যদিও এই মেলা ঐক্যবোধের অন্তরায় ছিল। অনেকেই এই মেলাকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারেনি 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করার জন্যে। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ স্বয়ং 'হিন্দুমেলা কথাটির বিরোধিতা করে বলেন হিন্দুমেলার নাম পরিবর্তনে 'ভারতমেলা' রাখাই উচিৎ। 'হিন্দুমেলা' কথাটি নিয়ে তর্কবিতর্কের

৩ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' : যোগেশচন্দ্র বাগল

পরিবেশ তৈরী তা হলেও, মেলার পুরোধা কর্মী, কবি ও নাট্যকারেরা মেলার সমর্থনে, বর্ণনা করে বলেন: "স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিয়মে ঐক্য নামক মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ, তাপ, প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক।......তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনও দেখি নাই। কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যাবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নানা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এ সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"[৪] এই মেলা ১৮৮০ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত সাধারণের মনে এক বিশেষ জাতীয়তাবাদের চেতনা সঞ্চার করেছিল। 'হিন্দুমেলা' ছাড়াও জাতীয়তাবোধের ঐক্য তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয় ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্য চেতনায়, গোষ্ঠিবদ্ধতার অনুপ্রেরণা ও সাধারণ রঙ্গ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা এবং ন্যাশনাল থিয়েটারে রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় বঙ্গীয় প্রজাগণকে ঐক্যবদ্ধ, স্ব-নির্ভর ও আত্মশক্তি অর্জনের অনবদ্য প্রেরণা দান করেছিল। বলাবাহুল্য "বাংলার গণ আন্দোলন বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিস্ফোরণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ থেকে নয়, বঙ্গভূমির চিন্তা-

---

৪ হিন্দুমেলার কার্য বিবরণ : পৃ. ৪২-৪৩।

নায়ক মননশীল অগ্রসর সম্প্রদায়ের অথবা উঁচু নীচু নির্বিশেষে জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন নাড়ীর যোগ ছিল না, পক্ষান্তরে এর প্রতি অনীহাই ছিল। উঁচু তথা নীচুতলা কাঁপিয়ে বঙ্গভূমিতে যে গণ-আন্দোলন হয়েছিল তার নাম নীলবিদ্রোহ বা নীলচাষীদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। যা রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' প্রতিফলিত।"[৫] এই নাট্য রচনা, নাট্য নির্দেশনার ও প্রযোজনার মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নবচেতনার ঐক্য প্রসূত হয় তা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঐক্যে পরিণতি লাভ করে।

১৮৭৫-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীত স্বদেশ চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের আর এক অভীমন্ত্রের বাণী সারা দেশের জনগণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরতার পথে গভীর স্বাজাত্যাভিমানের পরিচয়ে; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে উঠে। এই সংগীতের তাৎপর্য বিশ্লেষণে সমালোচক সকল নানা সিদ্ধান্ত ও নানা মন্তব্য করেন; 'Invocation of the mother-land Bengal'[৬] কিংবা 'The Bande Mataram hymn is apparently addressed to both ideals."[৭]

১৮৮১ এতে 'আনন্দমঠ' এ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকারূপিনী মৃন্ময়ী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্বক চিন্ময়ীরূপ দর্শন করেন। দেশ মৃত্তিকাই দেশ মাতৃকা রূপে বাঙালীকে নবজীবনের সন্ধান দিলেন। বাঙালীর স্বাভাবিক ভাবপ্রবণ চেতনায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন ও কল্পনার প্রকাশে মূর্ত হয়ে ওঠে বস্তু ও আত্মিক সত্যের মহিমময় রূপ। সাহিত্য-গুরুর সাধনার পুণ্যপীঠে বাঙালী দেখল অনুশীলন ধর্মের প্রবর্তন। সাহিত্য স্রষ্টার সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে

৫ বৃটিশরাজরোষে সাহিত্য ও প্রকাশ : পুলকেশ দে সরকার
৬ Sir Henry Cotton : The Times, Sept. 13 1906
৭ J. D. Anderson : The Times, Sept. 24. 1906

পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শই প্রতিফলিত জাতির বৃহত্তর কল্যাণাদর্শের সঙ্গে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; জাতীয়তা-বোধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলায় এক সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণের প্রেরণা দেয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে British Indian Association আবির্ভাব হয়েছিল সেকালে সর্ববিধ অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রকল্পে। যে কোন ঘটনার প্রতিকার লাভের আশায় মানুষ British Indian Association-এর কাছে আবেদন-নিবেদন করেছে। British Indian Association ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও গঠিত হয়েছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্যে। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'Indian Association'। এই Indian Association এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন "এই সমিতি সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হইবে।...আমরা নতুন রাজনৈতিক সংস্থার নাম দিলাম ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।"[৮] ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষাতেই Indian Association সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে জনসভার আয়োজন করেন। সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগঠিত করার কালে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "the awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of India." সুরেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টাকৃত ফলই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব। Indian National Congress এর প্রথম আবির্ভাব অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিরূপে স্যার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের কয়েকটি

৮ 'the unification of the Indian races and peoples upon the basis of common political interests and aspirations.'

উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, কংগ্রেসের কাজ হবে "১) সাম্রাজ্যের [অর্থাৎ ভারতবর্ষের] বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপন ২) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে জাতি ধর্ম এবং প্রাদেশিকতা হইতে উদ্ভূত সংস্কারের [prejudices] মূলোৎপাটন করা এবং লর্ড রিপণের 'চিরস্মরণীয় শাসনকালে [Ever memorable reign] উদ্ভূত জাতীয় ঐক্যের ভাবকে [Sentiments of national unity] বিকশিত ও দৃঢ়মূল করা।'[৯]

কংগ্রেসের এই সাধারণ কর্মনীতি, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মনীতিরূপে দেশের সর্বত্র জাতীয় আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গক্রমে ১৯০৪ সালে কংগ্রেস সভাপতি স্যর হেনরী কটন বলেন: "The growth of an Indian nation is the great political revolution that is working before our eyes." এই রাজনৈতিক বিপ্লবই জাতীয় ঐক্যের আদর্শ রূপায়ণের সূত্রপাত ঘটায়। এ প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে স্যর ফিরোজ শাহ মেহেতা বলেন: "কংগ্রেসের সভ্যগণ জাতীয়তার ভিত্তিতেই সম্মিলিত হন, কারণ তাঁহারা এক দেশের নাগরিক, এক শাসন কর্তৃপক্ষের অধীন, এক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এক প্রকার অধিকার অর্জনের এবং এক প্রকার বোঝা হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত"* বলেই কংগ্রেসের এই প্রেরণা ও পরিণাম দেশের সর্বত্র বিভিন্ন গঠন মূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন গঠন-মূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় দেশে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে। এই জাতীয় চেতনার সঙ্গে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিসমূহসহ, সংবাদপত্রের মালিক এবং সম্পাদকের

৯ ভারতের ঐক্য: অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* প্রাগুক্ত

ভূমিকা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। বলাবাহুল্য "উনিশ শতকের রেনেশাঁসের পুরোধাগণ প্রায় সকলেই ছিলেন সাংবাদিক। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চিন্তা সাংবাদিকদের মাধ্যমেই সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে সাংবাদিকরা শুধু সম্পাদকীয় লিখে ক্ষান্ত নন—সংবাদপত্রের কার্যালয় থেকে তাঁরা নেমে এসেছেন জনসাধারণের মাঝে।" এই প্রসঙ্গেই ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকার বিষয় হিসাবে যে কথা বলেছেন তা আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য :

১) বিভিন্ন সভা সমিতি ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বাঙালী সংবাদপত্রসেবীরা জড়িত ছিলেন। অনেক সংবাদপত্র এইসব সংগঠনের মুখপত্র হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। ওই সমস্ত সভা সমিতি ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঙালীর যে সব স্বাধিকার চিন্তা প্রকাশ পেত বহু বাংলা সংবাদপত্র তা সমর্থন করতেন এবং জাতীয় লক্ষ্যের দিকে নিজেদের পরিচালনা করতেন। বহুক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্র এইসব সংগঠনগুলোকে সাহস ও প্রেরণা যোগাতেন এবং অনেক অগ্রবর্তী রাষ্ট্রচিন্তাও এইসব সংবাদপত্রে প্রকাশ পেত। রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সে সব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতেন বাংলা সংবাদপত্রগুলি সেগুলি নিয়ে জনমত গঠন করতেন।

৪) স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ও জাতীয়তার প্রসারে বাঙ্গালী মনীষীদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টায়...সংবাদপত্রের সমর্থন ছিল। জাতীয়তার উদ্বোধনে..সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল গৌরবময়।"[১০]

ভারতীয় স্বাধীনতাযুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সংবাদপত্রের

---

১০ 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নব জাগরণ' : ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : পৃ. ২৩২-২৩৩।

সক্রিয় ভূমিকা বৃহত্তর স্বাধীনতাযুদ্ধকে তরান্বিত ও সার্থকতার পথে নিয়ে যায়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা এবং স্বদেশীযুগের বিপ্লবীদের চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদী চেতনার সমন্বয়ে যুগসন্ধির জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ হিতৈষণা-থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত জাতিকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিবেকানন্দের বন্ধন মুক্তির বাণী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে চিরন্তন সংগ্রামের মন্ত্র রূপে সিদ্ধ। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ থেকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী হলেও—তাঁর স্বদেশ-প্রেম সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রীয় দর্শন ছিল অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রক্তাক্ত বিপ্লব বা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন নি। তিনি এক মহান কর্মময় জীবনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন দেশবাসীকে "I am superior to many, I am inferior to few, but no where I am the last' I can also do something," এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির প্রেরণাই পরবর্তীকালে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ায়; দেশে 'গণমুখী দেশাত্মবোধ', বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অত্যুজ্জ্বল মহিমান্বিত ভূমিকা বিভিন্ন গণসংগঠন ও দেশবাসী তথা যুবশক্তিকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কেবলমাত্র স্বাদেশিকতার অর্থে সংকীর্ণ ছিল না। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার' তাই তাঁর সংগ্রামের সঙ্গে ছিল ভারতপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের সার্বভৌম প্রেরণা। স্বামীজীর সংগ্রাম ও স্বপ্ন কেবলমাত্র স্বদেশগত নয়, বিশ্বের সামগ্রিক সংগ্রামই—তাঁকে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংকল্পে ব্রতবদ্ধ করেছিল। তিনি একদা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন: "বর্তমান ব্রিটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক আছে, অজ্ঞাত-সারে বৃটেন ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। সাধারণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হত—অনুকূল

পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা হলে ভারতের পক্ষে এর ফলাফল আরো কত বিস্ময়কর হতে পারত। কিন্তু রক্ত শোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে যথার্থ কল্যাণকর কিছু হতে পারে না।...এই তো অবস্থা শিক্ষা বিস্তার বন্ধ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত [অনেক আগেই আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে], যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য আমাদের দেওয়া হয়েছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।...ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে; বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি ।..আমাদের কোন আশা নেই যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, তিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন! তেমন কোন ভগবান আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে।''[১১] ভারতের শ্রেণী দ্বন্দ্বে শোষক ও শোষিতের মধ্যে দুইশক্তি পরস্পরের মুখোমুখী। স্বামীজী ভাবতেন শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সমাধান না হওয়া অবধি ভারতের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থাকবে।

বিশ শতকের মানব প্রেমিক ও স্বদেশের মুক্তিকামী এই প্রাণ পুরুষ স্বামীজীর বিপ্লব সাধনা জাতীয় জীবনে এক নবতম অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। তাঁরই চিন্তা ও চেতনালব্ধ ভারতবর্ষের বিপ্লব সাধনা ও সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ও বিদেশের বহু মুক্তিকামী মানুষেরা তাঁর পদপ্রান্তে নত হয়েছিল। তাঁরই অনুগামীপুষ্ট বিদেশী ললনা লোকমাতা নিবেদিতার নাম কে না জানে।

১১ ১৮৯৯ সালের ৩০শে অক্টোবর শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর পত্র থেকে।

স্বামীজীর প্রেরণাই তাঁকে সার্বিক বিপ্লবের পথে নিয়ে যায়। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসীর দর্শনের সঙ্গে স্বামীজীকে গুরুপদে বরণ এবং পরাধীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতির জন্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। আয়ার্ল্যাণ্ড মহিলা মার্গারেট নোবেলের সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয়, বিবেকানন্দের জীবনে এক আশার আলো জ্বেলেছিলেন বলেই, ভারতবর্ষের মুক্তির সাধনার জন্যে স্বামীজী মার্গারেট নোবেলেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশেই নিবেদিতা শুরু করেছিলেন জীবনযুদ্ধে, নব-জীবনের দীক্ষা গ্রহণ। গুরু স্বামীজীর চিন্তা ছিল যে মানবপ্রীতির সঙ্গে স্বদেশপ্রীতির অভিসন্ধিতেই ভারতবর্ষের সিদ্ধিলাভ সম্ভব। আর এই ভারতবর্ষের সিদ্ধিলাভের সঙ্গে দেশের আমূল সংস্কার আগে চাই। এর জন্যে চাই শিক্ষার অধিক বিস্তার। মানুষকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলার মধ্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্যের আলোক-স্নাতদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সংঘবদ্ধ আন্দোলন তখনই সম্ভব যখন দেশের জনসাধারণ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। স্বামীজীর শিক্ষা চিন্তার মূল প্রেরণা ও সূত্র ছিল শিক্ষাবিস্তার। এ বিষয়ে একদা তিনি নিবেদিতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন: 'দেখতে পাচ্ছি কোন অভাবিত উপায়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। কিন্তু যদি নিজেকে উপযুক্ত করে না তোলে তিন পুরুষের বেশী টিকবে না।...তোমাদের প্রথম কাজ হল জনসাধারণের মনে শিক্ষা বিস্তার'। তিনি আরও বলেছিলেন: 'আমার আদর্শ হচ্ছে মানুষের অন্তরের মাতৃত্বকে জাগিয়ে তোলা, সেটাকে জীবনের সর্বত্র সার্থক করার শিক্ষা দেওয়া।" বিবেকানন্দের এই চিন্তাপথ অবলম্বনে ভাবশিষ্যা মার্গারেট তথা ভগিনী নিবেদিতা পদানত, লাঞ্ছিত, শোষিত, নিপীড়িত ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনায় দেশের সর্বত্র সিস্টার নিবেদিতা-

রূপে আর্বিভূতা হয়েছিলেন, সংস্কারের সব বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। স্বামীজীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই সুচিন্তিত-ভাবে তিনি ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি সাধনায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। নিবেদিতার মহৎ প্রেরণাতেই দেশের সর্বপ্রথম অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়েছিল। যদিও ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ও সরলা ঘোষালের নেতৃত্বে ও প্রচেষ্টায় এই সমিতির কর্মসূচী অগ্রগতি লাভ করেছিল। 'ভারতের মুক্তি প্রচারের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারাই এই সমিতি পরিচালিত হয়েছিল। যতদূর জানা যায় এর মধ্যে রাজা সুবোধ মল্লিকের খুল্লতাত হেমচন্দ্র মল্লিক, প্রমথনাথ মিত্র, সুরেন ঠাকুর এবং ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন এই সমিতির কর্ণধার। এই মুক্তিকামী দেশনায়ক কর্ণধারদের ভূমিকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য স্থান থেকে এই সমিতির কর্মপ্রয়াস যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করেন। ১০৮নং সারকুলার রোডের কেন্দ্রে যখন শ্রীঅরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার যোগ দিলেন, তখন তিনি নিজ শিক্ষক মারাঠী সন্তান সখারাম গণেশ দেউস্করকে এই সমিতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। এই সখারাম গণেশ দেউস্কর ও স্বামী বিবেকান্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন। "সখারামবাবু ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, মাথায় ছিল তাঁর বেশ মোটা এক গোছা শিখা, ভূঁড়ির উপর থাকতো লতিতুগ্ধ শুভ্র উপবীত।"[১২] সখারাম জন্মসূত্রে মারাঠী হলেও বাল্য-জীবন, শিক্ষা-জীবন থেকে আরম্ভ করে জীবন-সায়াহ্ন অবধি অবাঙালী মারাঠী ব্রাহ্মণ হিসাবে সাধারণভাবে পরিচিত হয়েও বাঙলা তথা বাঙালীর কাছে খাঁটি বাঙালী রূপেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলাদেশে তাঁর কর্মজীবনের ব্যক্তিত্ব নিদর্শনই নয়, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা অন্বেষণে দেখা যায়,— বঙ্গভূমিই তাঁকে আবাল্য লালন পালন করেছে। তিনি তাই

১২ অগ্নিযুগ : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃঃ ৭৯।

উচ্চকণ্ঠে সগর্বে উচ্চারণ করে বলতেন "I am proud to call myself a Bengalee" তিনি জীবনে বাঙলা ভাষাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলেন। 'জন্মগতভাবে মারাঠী হয়েও তিনি সেকাল ও একালের অনেকের চেয়ে বেশী বাঙালী ছিলেন। একদিকে শিবাজীর পূণ্য-নামের রণজয়ী ঐতিহ্য আর একদিকে সমকালীন সুতীক্ষ্ণ যুগ সচেতনা এ-দুয়ে মিলে সখারামকে যে অনন্যতা এনে দিয়েছিল, তার মহিমা ও প্রয়োজনীয়তা আজকের বাঙলা সাহিত্যে একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার শ্রেষ্ঠদান তার সাহিত্য ও সংবাদপত্র, একথা মনে রাখলে যে মারাঠী লেখক এ-দুয়ের মাধ্যমে তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন, তাঁকে জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার সম্মান দিতে হয়।'[১৩] এই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমী, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বোম্বাই প্রদেশের অধীন রত্নাগার জেলার দেউস গ্রামে। মোগল শাসনের শেষার্ধে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানা ছিল বহুধা বিস্তৃত। আজকের বিহারের পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাঙলা দেশের অধীনস্থ ছিল। এই সময়েই মারাঠা শক্তির প্রসার প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে। এই মারাঠা দেউস্কর বংশ এ-দেশে মহারাষ্ট্র থেকে চলে এসেছিলেন। মারাঠা সম্প্রদায় এই সময়ে সাঁওতাল পরগণায় একটি তালুক জুড়ে বসতি স্থাপনে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু কালক্রমে তাদের আধিপত্য বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা সম্প্রদায় দেশে ফিরে গেলেও, দেউস্কর বংশ আর দেশে ফিরে না গিয়ে কর্মাটায় বাস করতে থাকেন। তিনি বাঙলাদেশে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামেই সুখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'সখারাম' পিতার নাম 'গণেশ সদাশিব' এবং বংশের নাম 'দেউস্কর'। এই ত্রি-সূত্রবিন্যাসে তাঁর সম্পূর্ণ নাম 'সখারাম গণেশ দেউস্কর'।

---

১৩ বাংলাভাষার সাধক সখারাম : প্রণবরঞ্জন ঘোষ। (সখারাম স্মারকগ্রন্থ)

২.

সখারামের জীবন যাত্রা খুব একটা সুখের ছিলনা। সখারামের সমগ্র জীবনটাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। জন্মের শুভক্ষণেই সেই দুঃখের ইতিহাস সুচিত হয়েছিল--মাত্র পাঁচ-বছরের মাতৃবিয়োগের মধ্যে। মাতৃবিয়োগই তাঁর জীবনে অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে। তবে যতদূর সম্ভব পিতা গণেশ তাঁর জীবনের দুঃখকে গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে দেননি। সখারামের পিতা গণেশ তাঁর সাধ্বীপত্নীর লোকান্তরিতের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ না করে সখারামের জীবনের প্রতি অবহেলা হোক, এই কামনা পরিত্যাগে সখারামের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন নিজ ভগ্নীর উপর। পিতা গণেশের এই ভগ্নী যেমন বুদ্ধিমতী বিদুষী ও গৃহস্থকর্মে নিপুণা ছিলেন তেমন আদর্শবতী মহিলাও ছিলেন। তাঁর মহারাষ্ট্র সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ অধিকার ছিল। তাঁর একনিষ্ঠ যত্নে, উপদেশে, পরিশ্রমে সখারামের উত্তর জীবনকাল নানাভাবে পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছিল। তাঁর জীবন-সাধনায় মারাঠা সাহিত্যের প্রভাব পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করার মধ্যে বাংলা সাহিত্য ফুলে ফলে সমৃদ্ধিলাভে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রচেষ্টাকৃত প্রেরণা, মারাঠা সাহিত্য বাঙলার সাহিত্যের নিকট আত্মীয়তা অনুভব করে। মাতৃসমা পিসিমা, তাঁকে এই শিক্ষায় দীক্ষিত করে বলতেন: "তোমার জীবনের ব্রত হবে, বাঙালী ও মারাঠী এই দুটি মহান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, মহারাষ্ট্রের সাহিত্য ও ইতিহাসে যে সব গৌরবময় আদর্শ আছে, বাংলা দেশে তা প্রচার করা, আর বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে যা মহনীয়, মারাঠীদের সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।" মারাঠী ও বাঙালীদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার আজীবন ব্রত পালনে সক্রিয়

হয়েছিলেন মারাঠী এই মহামানব সখারাম গণেশ দেউস্কর।

সখারাম জন্মসূত্রে মারাঠী, চর্যাসূত্রে খাঁটি বাঙালীই ছিলেন। বাঙালী শিশুদের মতোই তাঁর শৈশবে হাতে খড়ি হয় বাঙলা বর্ণ পরিচয়েই। বাল্যকালে পিতার উৎসাহেই আধ্যাত্মজ্ঞানের সমন্বয় সাধন বেদ পাঠের সঙ্গেই ঘটেছিল। পিতাই তাঁকে এই মহৎ সাধনার প্রতি আকৃষ্ট করিয়েছিলেন। দেওঘরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেধাবৃত্তির পরিচয়ে শিক্ষকমণ্ডলী মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। তৎকালে দেওঘরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-কার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী ও স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণাত্মক ভূমিকা সখারামের জীবনে এনে দিয়েছিল নিষ্ঠা এবং একনিষ্ঠ সাধনা। যে সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আজীবন দেশসেবার মহৎ আদর্শের প্রেরণা।

ছাত্রজীবনে তাঁর ঋজু লেখনীর শক্তিমত্তার প্রকাশে দেশবাসী চমৎকৃত না হয়ে পারেনি। ছাত্রজীবনের দীপ্ত শানিত লেখনী সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'সাহিত্য'-এ নিয়মিত প্রকাশের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুভসূচনা সূচিত হয়। এই 'সাহিত্য' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যসাধক, সমালোচক, সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়। সখারামের জীবন-দর্শনে অতীত ইতিহাসের সাভিনিবেশ চর্চার লক্ষণ পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। ইতিহাস চর্চার মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সমন্বয়। 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক নানা জাতীয় উৎকর্ষ রচনায় দেশাত্মবোধ প্রচ্ছন্ন থাকতো। পূর্বেই বলেছি দেওঘরের শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসুর সাহচর্য সখারামের

ছাত্রজীবন দেশাত্মবোধ তথা জাতীয়তাবোধের আদর্শে গড়ে উঠেছিল। দেওঘরে থাকাকালীন তিনি কেবলমাত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্যে আসেননি। তিনি আরও একজন মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবন আদর্শ সযত্নে গঠন করে নিয়েছিলেন। তাঁর মহৎ আদর্শ ও মহৎ অনুপ্রেরণা সখারামের তরুণজীবনে এনে দিয়েছিল এক মহান কর্তব্যবোধ। যা তাঁর সমগ্র জীবনের ব্রত-সংকল্পে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন। সখারামের জীবনের এই অন্তরঙ্গ সুহৃদটি ছিলেন দেওঘর প্রবাসী জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা কর্মী ও কর্ণধার আচার্য রাজনারায়ণ বসু। আচার্য রাজনারায়ণ বসু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যাঁরা সকল দিক দিয়ে সমগ্র জাতিকে নতুন প্রেরণায় উদ্বেলিত করেছিলেন—তাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। তিনি একদিকে ধার্মিক, সমাজ সংস্কারক ও নির্ভীক দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর দেবতুল্য চরিত্রের কথা সারা ভারতে আজও বিখ্যাত। বাংলার ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, একনিষ্ঠ দেশ-হিতৈষী এবং পুণ্যচরিত্র রাজনারায়ণের স্থান চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

রাজনারায়ণের সঙ্গে আত্মিক সংযোগসূত্রেই সখারামের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েছিল অনির্বাণ জ্ঞানের দীপশিখা। রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগের ফলে তিনি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন যা তাঁর সাধনার অনুকূল হয়েছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন: "তিনি অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসু মহাশয় পরম ধার্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিশী লোক ছিলেন। সখারাম নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করতেন।"[১৪] বিভিন্ন বিষয় আলোচনা

১৪ ঋষি অরবিন্দ: ভূপেন্দ্রনাথ বসু। [শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি]

কালে সখারামের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পরিচয় দৃঢ়তর হয়। এই পরিচয় পরবর্তীকালে স্বার্থত্যাগের মহান কর্ত্তব্যে তাদের গ্রথিত হতে সাহায্য করেছিল।

অভাব অনটনে সখারামের জীবনে শিক্ষার আলো বেশীদূর প্রসারিত হয়নি। কিন্তু ব্যবহারিক ও প্রচেষ্টাকৃত শিক্ষা তাঁকে অনেক উচ্চ জ্ঞান-শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। জীবনে বাঁচার ও জীবিকার অন্বেষণে, তিনি শিক্ষাব্রতীরূপে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। চব্বিশ বছর বয়স কালে মাত্র ১৫৲ টাকার বিনিময়ে ১৮৯৩ সালে দেওঘর বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে তিনি যোগ দেন। শিক্ষক-তার কালে তাঁর সুনাম ছাত্রসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। "স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে খুব ভালবাসার পাত্র ছিলেন সখারামবাবু। দীর্ঘছন্দ, ঋজুদেহ, বিস্তৃত বক্ষ, দ্রুত দৃঢ় সঙ্কল্পের গতি, সুকৃষ্ণ গুম্ফ, ঘন ভ্রু-যুগ্ম, সুরসিক, সদাহাস্যপরায়ণ অথচ আদর্শবাদী মানুষটি ছিলেন ছেলেদের সব বড়-বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রাণ। আমাদের দরিদ্র ভাণ্ডার, কুষ্ঠাশ্রম, সাহায্য সমিতি, সবকিছুর উনিই ছিলেন হোতা। তখন ১৮৯৪ সাল, অত আগে আমরা এই সখারামবাবুর প্রেরণায় দাড়োম্বর নদীর শুষ্ক বালুচরে লাঠি খেলতুম। নন্দন পাহাড়কে দুর্গ করে একদল মোগল ও অন্যদল মাওলী সেনা সেজে যুদ্ধ করতুম। সখারামবাবুর জীবনে সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল শিবাজীর জীবন চরিত লিখে যাওয়া, মহারাজ বীরছত্রপতির এতবড় শ্রদ্ধালু পূজারী আমি আর দেখিনি। এঁর প্রাণাগ্নির আঁচ পেয়ে আমরাও নেপোলিয়ন ও শিবাজীকে করেছিলুম জীবনের আদর্শ পুরুষ।"[১৫] শিক্ষকতার অবসরকালে সাহিত্যচর্চার নেশা সখারামের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল। শিক্ষকতার কালেই তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সংবাদ নিয়মিত 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশের

১৫ আমার আত্মকথা : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

কৃষকের সর্ব্বনাশ।

"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।"

স্বজাতীয় হউন বিজাতীয় হউন, স্বদেশীয় হউন বিদেশীয় হউন, রাজা প্রকৃত পক্ষে জনসমাজের প্রতিনিধি মাত্র। সমাজের প্রতিনিধি-রূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সামাজিকগণের ধর্ম্মনীতি ও ধনসম্পত্তি রক্ষণের উপায়বিধান প্রভৃতি বিষয়ের সুব্যবস্থাপূর্ব্বক জনসমাজে সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। এই কর্ত্তব্যসাধন বহু-ব্যয়সাপেক্ষ। সেই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রজার নিকট হইতে রাজাকে কর গ্রহণ করিতে হয়। প্রজাও সুখশান্তির আশায় সানন্দচিত্তে রাজাকে কর দান করিয়া থাকে। রাজা একগুণ কর লইয়া এরূপ সুব্যবস্থার সহিত উহার ব্যয় করিয়া থাকেন যে, তাহাতে প্রজাকুল সহস্র গুণ উপকৃত হয়। তাই কবিকুলগুরু কালিদাস আদর্শ নরপতি দিলীপের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

প্রজার এরূপ অশেষ মঙ্গল-সাধন করেন বলিয়াই আমাদিগের শাস্ত্রে রাজাকে দেবাংশ-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে সদা কথা !]

'দেশের কথা' হ'তে সংকলিত ১৯০৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'কৃষকের সর্ব্বনাশ' এর প্রথম পৃষ্ঠার অনুলিপি

ফলে তা, তাঁকে প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে নিয়ে যায়। তিনি একই সঙ্গে বিদগ্ধ প্রবন্ধকার ও সৎ, আদর্শনিষ্ঠ, সাংবাদিকরূপে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জীবনে তিনি যেমন বড় প্রবন্ধকার হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আবার তেমনি একজন প্রতিথযশা নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'হিতবাদী' তৎকালীন বাংলায় বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে জনপ্রিয় ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি সখারামের সংবাদ পরিবেশনের অভিনবত্ব, পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্নকাব্য-বিশারদের খ্যাতি ছিল সমাজে যথেষ্ট। তিনিই আবিস্কার করেছিলেন দেওঘরের উক্ত তরুণ শিক্ষক ও সাংবাদিকটিকে। যাঁর উদীয়মান তীক্ষ্ণ লেখনী বাংলা সংবাদ পরিবেশনের ধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কখনো শিক্ষাব্রতী, কখনো সাংবাদিক হিসাবে বা অন্য কোন ভূমিকায় সর্বত্রই তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। তাঁর লেখনী-শক্তি পাঠককে মুগ্ধ করতো। পাঠকরা তাঁর লেখা সবিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন। কিন্তু তার লেখার প্রসাদগুণ ও উৎকর্ষতা পাঠকদের যতটা ভাবাতো অন্য লেখকদের লেখা তদনুরূপ ছিল না। তবে সখারামের পরিচয় তখন পর্যন্ত অনেকেই জানতে পারেন নি। তাঁর নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের কৃতিত্ব এবং নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তথ্যমূলক লেখনী হিতবাদী'র প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'হিতবাদীর' গৌরব ক্রমশঃ গগণচুম্বী হতে থাকে। কিন্তু একটিমাত্র ঘটনাই তাঁকে দুঃখের অমানিশার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। সখারাম স্থানীয় জেলা শাসকের কার্যালয়ের তীব্র সমালোচনা করে একটি তথ্যপূর্ণ সংবাদ 'হিতবাদী' সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করেন। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় সেই সংবাদটি যথাসময়ে পত্রস্থ করেন। সংবাদটি

প্রকাশের পর, সংবাদটির ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সখারামকে এক সূত্রে জানান যে, এই ধরনের সংবাদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে খুব সতর্ক ও সুনিশ্চিত থাকবেন, নতুবা সংবাদদাতা ও সম্পাদক উভয়েরই বিপদ এমন কি বেচারা মুদ্রাকরও রেহাই পাবেন না।" যে কথা সেই কাজ। কাল বিলম্ব ঘটলো না। সংবাদটি নিয়ে হুলস্থুল পড়ে গেল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিগোচর হতে বাকী রইলো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হার্ডি সাহেব সখারামকে আহ্বান জানালেন তার নিজের বাড়ীতে। চাকুরী থেকে কর্মচ্যুত হবার সম্ভাবনা নিয়ে মিঃ হার্ডির সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে কর্মজীবনের ঝুঁকি নিয়েই মিঃ হার্ডির সঙ্গে তাঁর প্রেরিত সংবাদটি নিয়ে মোকাবিলা করেছিলেন। মিঃ হার্ডি ছিলেন সখারাম যে স্কুলে চাকরী করতেন সেই স্কুলের সভাপতি। সে জন্যে হার্ডির পক্ষে সখারামকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করতে কোন অসুবিধা ছিল না। বরখাস্ত তো হলেনই, উপরন্তু মিঃ হার্ডির ব্যবহারও তাঁকে আরও রুষ্ট করে তোলে। ইংরেজ শাসক মহাশয় সোজাসুজি তাঁকে নির্দেশ দেন "I also order your externment from Deoghar, you are to quit the place soon', তিনি কর্মচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু সাহেবের রক্তচক্ষুকে তবুও গ্রাহ্য করেন নি। দেওঘরে থাকাকালে তাঁর প্রতিবহু অন্যায় অবিচার করা হয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষে দেওঘরে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। সেকালে 'যোগীন্দ্রবাবু ও সখারাম দুইজনেরই বাঙ্গালা লেখক অপবাদ ছিল। তাই দুইজনে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকরি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সপরিবারে জীবিকার সন্ধানে কোলকাতায় এসে উঠে ছিলেন সখারাম। কোলকাতায় এসে খুব একটা বাধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়নি,

স্বপ্রতিভ গুণবত্তায় এবং কর্মকুশলতায় 'হিতবাদী' পত্রিকা তাঁকে 'Proof Reader'-এর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। সখারাম 'হিতবাদী'তে লিখেছিলেন, সেই সন্দেহে কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলেই বিশারদ তাঁকে 'হিতবাদী'তে চাকুরী দিয়েছিলেন। মাত্র তিরিশ টাকার মাসিক মাহিনা থেকে ক্রমশঃ সম্পাদকের একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছিলেন সখারাম। 'হিতবাদী'তে চাকুরী করা কালেই সখারামের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জীবনে নানা সংকট ও সংঘাত থাকা সত্ত্বেও, সখারাম তাঁর স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে ১৯০১ সালের ২৩শে জানুয়ারী 'মহামতি রানাডে' গ্রন্থটি প্রকাশিত করতে সক্ষম হন। ১৯০১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়—'ঝাঁসীর রাজকুমার'। ১৯০২ সালে ২৪শে জানুয়ারী 'বাজীরাও' গ্রন্থখানি রচনা করে তিনি পাঠক সমাজে বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 'নব্য ভারত' এ সম্পর্কে লেখেন : 'এ দেশে বাজী রাওয়ের ন্যায় ন্যায়বান বীরের কাহিনী প্রচারিত হইলে, বাস্তবিকই প্রভূত উপকার হয়। এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালীর বিশেষ উপকার করিলেন।' ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনার কৃতিত্বে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সুধী সমালোচক-সকল। সেই সঙ্গে দেশের বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক ও ঔপ-ন্যাসিকরাও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা এবং উপাদান নির্বাচনের তারিফ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখেছিলেন যে: 'বাংলা ভাষায়……তিনখানি পুস্তক লিখিয়া আপনি প্রকৃত পক্ষে দেশের উপকার সাধন করিয়াছেন।' 'শ্রীমতী কাশী বাঈ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'আনন্দী বাঈ'র যে অতি প্রকাণ্ড—রয়াল আট পেজী ৪২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন·-তাহাই···প্রধান অবলম্বনে"

১৬. আনন্দী বাঈ [২৫ মার্চ ১৯০৩]।

একে একে নামাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি বাঙালীর গণমানসে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর সমাজ-চেতনা ও স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রীতিবোধে সবাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিল। ইতিহাসের অজ্ঞাত অবজ্ঞাত রত্নরাজী আহরণপূর্বক বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে গিয়েছিলেন তিনি 'শিবাজী প্রসঙ্গ' [সাহিত্য ১৩১২, শ্রাবণ] 'প্রাচীন মহারাষ্ট্র' [সাহিত্য ১৩০০, পৌষ], 'মহারাষ্ট্র সাহিত্য' [১৩০৫ ভাদ্র, চৈত্র] 'শিবাজীর স্বার্থত্যাগ' [১৩০১ ধরণী, ফাল্গুন] 'মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন বিবরণ' [জন্মভূমি ১৩০১ মাঘ] প্রভৃতি লেখা তদানীন্তন পত্র পত্রিকাকে রসসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক রচনার প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল না, তিনি ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি-বিষয়ক নানান উপাদান সংগ্রহের প্রতিও সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি ধর্ম, পুরাণ ও সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ রচনায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। 'মনুপোক্ত সনাতনধর্ম' [ধরণী, ১৩০১ মাঘ] 'বৈদিক আলোচনা' [ভারতী, ১৩০২ অগ্রহায়ণ] 'সুরাপান' [শাস্ত্রীয় বিচার] [১৩০৩, ভারতী আষাঢ়] প্রভৃতি রচনা বিভিন্ন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আজও বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। সাহিত্য ও ইতিহাসের মণিকাঞ্চন সংযোগসাধন একমাত্র সখারামের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর যথার্থ জ্ঞানের পরিধি ও ব্যুৎপত্তি আমাদের আজও রোমাঞ্চিত করে। "সখারামের রচনা-বলীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই মারাঠা ইতিহাসের বিষয়বস্তু কিছু প্রাধান্য লাভ করেছে। শিবাজী রাণাডে তিলক ছাড়া লক্ষ্মীবাঈ, বাজীরাও, আনন্দী বাঈ প্রভৃতির প্রসঙ্গও তাঁর গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তু"। মারাঠা ইতিহাসের প্রেরণা সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেদিক থেকে সখারামের

এই ইতিহাস চর্চা যেমন মূল্যবান, তেমনি বাংলা সাহিত্যে ভারত-ইতিহাসের ব্যাপক পরিচয়ে এ জাতীয় গ্রন্থের ভূমিকা। সর্বভারতীয় নব জাগরণের ইতিহাসে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় যে উপাদান নিহিত রয়েছে, তা সখারামের মতো লেখকরাই সবচেয়ে ভালভাবে প্রচার করতে পারেন।" [১৭]

১৭. বাংলা ভাষার সাধক সখারাম—প্রণবরঞ্জন ঘোষ [সখারাম স্মারক গ্রন্থ]।

৩.

১৯০৭ সালে জাপান থেকে ফেরার পথে জলে ডুবে 'হিতবাদী' পত্রিকার কর্ণধার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের মৃত্যু হলে 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ 'হিতবাদী'র সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে। 'হিতবাদী' সম্পাদনার কালেই ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে অশান্তির কালো মেঘ ধূমায়িত হয়েছিল। তখন কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কলহ দক্ষযজ্ঞে পরিণত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগের রাজনৈতিক কলহ প্রথমে অনৈক্য পরে সংঘর্ষের মুখোমুখী হয়েছিল। এই কলহ প্রধানতঃ কংগ্রেসের তিন গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটেছিল। তাঁরা হলেন কংগ্রেসের নরম পন্থী ভাগ, যাঁরা ইংরেজ অধীনস্থ শাসনের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছিলেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠী কংগ্রেসের চরমপন্থী অংশ, যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের নিয়ন্ত্রনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করেছিলেন অর্থাৎ যাঁরা বিদেশী দ্রব্য বয়কটের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয়তঃ বিপ্লববাদী অংশ যাঁরা সন্ত্রাসে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের ফলে তিনটি গোষ্ঠির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষের পরিণতিতে সেদিন এক বিরাট বিরোধস্থষ্টির সম্মুখীন হয়েছিলেন দেশের নেতৃত্ব। সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে ভারতীয় রাজনীতির ভূমিকা পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ অন্যভাবে বদলে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের কর্ণধার স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকেই সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডকারখানা জানা যায় "জনতা মঞ্চের দিকে ধাবিত হইলেও আমি সেইখানেই রহিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে আমাকে, স্যার ফেরোজ শা মেহ্তাকে

ও অপরাপর কয়েকজনকে তাঁহারা পিছনের তাঁবুতে লইয়া গেলেন এবং পুলিশ আসিয়া প্যাণ্ডেল হইতে সমস্ত লোকজন সরাইয়া দিল। এই প্রকারে কংগ্রেসের এক স্মরণীয় অধ্যায়ের অবসান হইল এবং এক নূতন অধ্যায়ের সুরু হইল।"[১৮]

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় দলের আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শ। জাতীয় দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় দলের অগ্রণী নেতা ছিলেন বটে তবে জাতীয় দলের স্বাধীনতাকামী আদর্শকে সমর্থনের বদলে আবেদন নিবেদনের নীতিকেই তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়কে জাগ্রত করতে। কিন্তু মধ্যপন্থী নেতারা তা চাইতেন না। একমাত্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলক জাতীয় দলের নেতারূপে সারা দেশে জাতীয় ভাবের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার বাইরেও জাতীয় দলের আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক জাতীয়তার তূর্যনিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সতীদাহ প্রথা বিলোপ আন্দোলনের পর, বাংলা দেশে যে আন্দোলনটি নিয়ে দেশের নেতৃবৃন্দ ঝড় তুলেছিলেন, সেই বিতর্কিত আন্দোলনটি 'Age of Concent Act' নামে সর্বাধিক পরিচিত। বাংলায় যার নাম 'সহবাস সম্মতি আইন'। বাংলা দেশের সমাজ, ধর্মও সংস্কার নিয়ে রক্ষণশীল সম্প্রদায় ব্যাপক জনমত গঠনের যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে 'রামমোহনও তাঁর সহযোগীরা, ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁদের উন্নতিশীল ভাবধারা ও

---

১৮. A Nation in Making by S. N. Banerjee

বলিষ্ঠ সংস্কার কর্মের ভিতর দিয়ে বাংলার সমাজ মানসকে উজ্জীবিত ও প্রগতিমুখী করে তুলেছিলেন।"[১৯] সেই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কারকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক মহান কর্মী। তাঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক উপরি-উক্ত ভাবধারার একজন ঋজু প্রবক্তা। তিনি সহবাস সম্মতি বিলকে কেন্দ্র করেই রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। "এ বিলের বিপক্ষে...প্রচুর লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতা এবং লেখার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে তিনি রাজনীতি টেনে এনেছিলেন—এক কথায় শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ বিরোধী একটি জনমত গড়ে তুলতে পেরেছিলেন Tilak objected not so much to the provisions of the bill, which prohibited the consummation of marriage by young children, as to the claims of a foreign Government to impose its will upon the domestic arrangments of Hindu families.।"[২০] লোকমান্য তিলকের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও সহবাস সম্মতি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 'স্বদেশী বীজ উপ্ত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

লোকমান্য তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা দেশের শিক্ষিত মানুষদের স্বাধীনতার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁদের সৃষ্ট জাতীয় দলের কর্মনীতিকেই পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন সখারাম। সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের উদারপন্থী ও চরম পন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্যে সংঘর্ষের 'দক্ষযজ্ঞ' কাণ্ডের পর থেকে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে আর কিছুইবাকী ছিল না। তখনকার

১৯. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ

২০. সম্মতি আইন ও পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া—মুনতাসীর মামুন [বিচিন্তা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪]

দিনে কংগ্রেসের নীতি ছিল যে প্রাদেশিক কমিটি সভাপতি নির্বাচন করতে পারবে না। কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনই ছিল কংগ্রেসের নীতি। সুরাট অধিবেশনে মধ্যপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন এবং জাতীয় দলের পক্ষে লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাবের সঙ্গেই বাক্‌যুদ্ধ ও বাদবিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে যায়। সেই সময়ে 'হিতবাদী' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী সখারামকে জাতীয় দলের নেতা লোকমান্য তিলকসহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মসী চালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু সখারাম তাঁদের নির্দেশ মেনে নিতে পারেন নি। বিপ্লবী সখারাম জাতীয় নেতাদের মহান কর্তব্যের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে অস্বীকার করেন। অসচ্ছল সংসারের অবস্থা জেনেও তিনি 'হিতবাদী'র চাকুরী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে দুঃখ বরণে এতটুকু কাতরতা প্রকাশ করেননি। 'হিতবাদী' সম্পাদকের সামান্য চাকুরীর চেয়েও তাঁর কাছে দেশের স্বার্থ অনেক, অনেক বড় বলেই মনে হয়েছিল। অপরের মতে আত্ম বলিদান তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ। 'হিতবাদী'র বিজাতীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বেচ্ছায় 'হিতবাদী'র সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি অকুণ্ঠচিত্তে। তিলকের সমর্থনে এবং জাতীয় দলের পক্ষ অবলম্বনে তাঁর রচিত গ্রন্থে তিলকের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে লিখেছিলেন: 'সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন কালে শ্রীযুক্ত তিলক যে ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের এ স্থলে আলোচনা ক্লেশকর হইলেও তিলক মহাশয় তাঁহার কেশরী ও মারাঠা পত্রে আত্মসমর্থন করে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে সন্নিবিষ্ট না করিলে তাঁহার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হইবে।...সুরাটে কংগ্রেস হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

৪.

স্বাধীনতা সংগ্রামে সখারাম একদিকে যেমন বিচক্ষণ সম্পাদক ছিলেন তেমনি ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক। নির্ভীক ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রসিদ্ধি ও সাধনাই তাঁকে 'হিতবাদী'র সম্পাদক পদে বসিয়েছিল। আবার নির্ভীক ও দীপ্ত পৌরুষই তাঁকে সম্পাদকের চাকরী থেকে অনেক দূরে চলে আসতে বাধ্য করেছিল। একশো টাকার মাইনে তাঁর কাছে বড় ছিল না। বড় ছিল মানবতাবোধ, যে মানবতাবোধ তাঁকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর নির্ভীকতাকেই লক্ষ্য করে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন : 'সখারামের মতো সাংবাদিক বিরল।' জাতীয় জীবনের চরম সংকট কালে ভারতে যে নবযুগের সৃষ্টির উদয় ভেরী রণরণিত হয়েছিল, তার অন্যতম পুরোধাকর্মী সখারাম ছিলেন একজন চরমপন্থী কট্টর জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী। রাজনীতির ক্ষেত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনো প্রকার আপোষ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপন্থায় ছিল না। জীবনে আপোষ মীমাংসায় সমতারক্ষা না করতে পারার জন্যই তিনি জীবনে বহু দুঃখকষ্টের মুখোমুখী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সহজে মাথা নত করা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অধিকন্তু তিনি কখনও আদর্শবিরোধীও কার্যকলাপে লিপ্ত হোন নি। 'হিতবাদী'র সম্পাদকের কার্যভার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নাশান্যাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে যোগদান করেছিলেন। ইতিহাসে সখারামের দক্ষতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সমগ্র জীবনসাধনায় ইতিহাসচর্চাতেই কাল কাটিয়েছিলেন। কিন্তু বিধাতা বাম, নাশান্যাল কলেজেও তাঁর চাকরী বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। সরকার তাঁর সমস্ত আয়ের উৎস পথ বন্ধ করে দিয়ে, তাঁর

জীবনে এক চরম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ২৮শে জুলাই 'দেশের কথা' থেকে সংকলিত 'কৃষকের সর্বনাশ' গ্রন্থখানাও সারাদেশে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। যার পরিণামে সরকার বইখানা বাজেয়াপ্ত না করে পারেনি। "সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা সেকালের খেটেখুটে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখা তথ্যমূলক বই। সভ্য সরকারের বক্তব্য ছিল ঐ সব তথ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করে পাল্টা বই প্রকাশ করা। কিন্তু তখনকার দিনে প্রশাসকদের মাথায় ছিল—হোক সত্যি কথা, সত্যি কথা অসন্তোষের কারণ হলে তাই-ই রাজদ্রোহ"*।[২১]

সখারামের 'দেশের কথা' সত্যভাষণের স্পষ্ট দলিল। এ বই বাজেয়াপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। "স্বদেশী বা বঙ্গ-বিপ্লব যুগে...অবশ্য পাঠ্য ছিল; 'গীতা', 'ব্রহ্মচর্য', 'বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী'; 'আনন্দ মঠ', শরৎ চক্রবর্তীর 'স্বামী শিষ্য সংবাদ', 'দেশের কথা' ইত্যাদি। গীতা-ব্রহ্মচর্য-আনন্দ মঠ প্রভৃতি আমাদের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের চরিত্র গঠনের বনিয়াদ দৃঢ়ভিত্তিক করবার সহায়ক হয়েছে ও ভাবগত প্রেরণা যুগিয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের বস্তুগত ভাবে কাজে লেগেছে 'দেশের কথা'।[২২] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছিলেন:

২১. বৃটিশ রাজরোষে সাহিত্য ও প্রকাশ: পুলকেশ দে সরকার

* ১৮৭০ সালের পেনাল কোডের [১২৪ক ধারা] সঙ্গে সংযোজিত নতুন সিডিসন বা রাজদ্রোহী আইনে বলা হয় যে "যেই সরকারের প্রতি অপ্রিয় মনোভাব সৃষ্টি করবে বা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে। সেই শাস্তি জরিমানা, জেল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।" এই আইনের আওতায় ১৮৯১ সালে—'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। এই আইনের ১৮৯৭ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। আর এই আইনেই পরবর্তীকালে স্বয়ং গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

২২. স্মৃতি তর্পণ: নলিনী কিশোর গুহ (শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ)

"সরকার হইতে তাঁহার সামান্য আয়ের উপায় 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মোকদ্দমা' পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ হওয়ায় বন্ধ হইয়া গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় পরিষদ' এর শঙ্কিত কর্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপক পদ ত্যাগ' করিয়াছিলেন। সখারামের এই আত্মত্যাগ দেশের পক্ষে কত বড় গৌরবজনক ঘটনা তা আমাদের ভাবনার বাইরে। "কালের পদক্ষেপে আত্মপরিচয়, হীনতা, দৈন্যের, পাশে দৃষ্টি পড়তে লাগল অতীত গৌরবের প্রতি, নতুন করে ভারতাত্মার আবিষ্কার—স্বামী বিবেকানন্দ এমনই এক মহাকাল পুরুষ, যার আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন, অসামান্য প্রতিভাধর ঈশ্বরচন্দ্র। 'মানস জগতে বিস্ফোরণের বৈষয়িক পার্থিব জগতের বিস্ফোরণ একটা ঘটতই; কার্জনের বঙ্গভঙ্গ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ১৯০৩ থেকে কলায় কলায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৫ এ পূর্ণচন্দ্র।[২৩] এ পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ আলোর জোয়ারে সখারামের স্বদেশী সংকল্প ও জেহাদ, বাঙলা তথা ভারতবাসীকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে 'বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল। সখারাম গণেশ দেশের জনগণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মা-মাটি-মানুষের অবস্থানের কথা। 'দেশের কথা' প্রকাশ হয়েছিল যে সময়ে তখন "বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে সমগ্র বঙ্গভূমি উঁচুতলা থেকে নীচুতলা অবধি যে ঐক্যবোধের পরিচয় দিয়েছে এমন আর কখনো দেয়নি, স্বদেশী সংকল্পে এমন দৃঢ় মন বাঙালী আর কখনো দেখায়নি; বিলাতি বর্জনের শপথ কোনও কালে এত জোরে উচ্চারিত হয়নি; প্রথম আগল ভাঙার সঙ্গীতময় বঙ্গভূমির এমন অপরূপ আর কখনো দেখা যায়নি। বিদ্রোহ, রাজদ্রোহ, সিডিসান ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬ জুড়ে। চারিদিকেই সর্বক্ষণ ইংরাজ প্রশাসকরা গন্ধ

২৩. বৃটিশ রাজরোষে সাহিত্য ও প্রকাশ—পুলকেশ দে সরকার

পাচ্ছে বারুদের, নীলকরদের 'শ্যামচাঁদ' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের করধৃত এখন উদ্যত, আরক্ত। সামান্য 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি কাউকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট যেন। বঙ্গ তারুণ্যেও তেমনি অটুট জেদ; রাম প্রসাদের মা এখন পলিটিক্যাল মা।"[২৪] ঠিক এই সময় সন্ধিক্ষণে সখারাম গণেশের 'দেশের কথা'র উপর পড়েছে রাজরোষের খড়্গ। বৃটিশ শাসকের সর্বাত্মক রাজরোষে পতিত মানুষের চোখের সামনে 'দেশের কথায়' সখারাম দুঃসাহসের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ভেদনীতি, চতুর কর্মগুণের কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন : 'অতুল ধনশালী ইংলণ্ডে প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যে পরিমাণ আয়কর সংগৃহীত হয়, তাহার চতুর্গুণ অর্থ সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতি দরিদ্র ভারত বর্ষে রাজপুরুষেরা সামরিক বিভাগের জন্য এ দেশীয় আয়করের চতুর্দশগুণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন! এই বিভাগের প্রভূত বেতন ভোগী কর্মচারীদিগের সকলেই শ্বেতাঙ্গ। সুতরাং এই টাকার অতি অল্পাংশ দেশে থাকে—অধিকাংশই বিলাতে চলিয়া যায়।'[২৫] এমন দীপ্ত, শাণিত, বাস্তব সত্যনিষ্ঠ লেখনী পাঠে কোন সরকারের না রাগ হবে। মহামান্য বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের সন্ত্রাসমূলক প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। আতঙ্ক-গ্রস্থ সরকার ১৯১০ সালে সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্যে কঠোর আইন বলবৎ করেছিলেন, তাতে আড়াইশোরও বেশী ছাপাখানা ও তিন-শোরও বেশী সংবাদপত্রের জামিন দাবী করা হয়েছিল। অন্ততঃ পক্ষে পাঁচশোরও অধিক গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তদানীন্তন বিদেশীয় কর্তৃপক্ষ। বই বাজেয়াপ্তের তালিকায় উল্লেখ্য গ্রন্থগুলির

২৪. বৃটিশ রাজরোষে সাহিত্য ও প্রকাশ : পুলকেশ দে সরকার [গ্রন্থজগৎ হীরক জয়ন্তী ১৯৭২]

২৫. দেশের কথা : সখারাম গণেশ দেউস্কর পৃ. ১৪৪

মধ্যে দেখা যায় : অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'আশা কুহকিনী', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', সুরেশচন্দ্র বসুর 'পণ্ডিচেরী হলো কি?' অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মুক্তি কোন পথে'। গঙ্গাচরণ নাগের 'রাখী কঙ্কণ' সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইলের 'অনল প্রভা' এ ছাড়া ইংরেজী গ্রন্থগুলির মধ্যে Har Dayal-এর 'Social Conquest of Hindu Race' F. D. Shah and G N. Desai, Hadiad এর The Indian National Songs, H. R. Bhagat, Poona এর 'Bande Mataram, M. K. Gandhi এর 'Indian Home Rule' প্রভৃতি। সেইসঙ্গে এই দশকের উল্লেখ্য গ্রন্থ সখারাম গণেশের 'দেশের কথা'র বিরুদ্ধে কলকাতা গেজেটে সরকারী কর্তৃপক্ষ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। Gazette-এ এই মর্মে লেখা হয়েছিল :—

POLITICAL/NOTIFICATION

No 2840 P. D.—The 22nd September 1910.—Whereas it appears to the Lieutenant Governor that a Bengali book entitled 'Desher Katha' written and Published by Sakharam Ganesh Deoshkar, contains words of the nature described in section 4, sub-section (1) of the Indian Press Act (I of 1910), inasmuch as they have a tendency to excite disaffection to words His Majesty or the Government established by law in British India ;

Now, therefore, in exercise of power conferred by Section 12, Sub-Section (1), of the said Act, the Lieutenant Governor hereby declares all conies of the said book forfeited to His Majesty.

E. V. Levinge

Offg. Chief Secy. to the Government of Bengal

সরকার 'দেশের কথা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে, এবং গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে সখারামের স্বল্প আয়ের পথকে শুধু বন্ধ করে দিলেন না, সেই সঙ্গে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' এই গ্রন্থখানা বাজেয়াপ্ত করে সখারামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেও কুণ্ঠিত হলেন না। যদিও 'দেশের কথা' বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে, সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে ১৯১০ সালের ৮ই অক্টোবর 'হিতবাদী' লিখেছিল।

'Desher Katha' by Pandit Sakharam Ganesh Deuskar has been prescribed and confiscated by the Government of two Bengals on the grounds of its containing writings that are likely to create disaffection in the readers.

We have no wish to say anything against the decision of the officials. We would only refer to a few funny incidents in this connection. When the Pandit delivered to the Deputy Commissioner of Police. Mr. Tegart, all the copies of the above book in his own possession he was asked by that officer how many Copies in all of the different editions of that book he had been able to sell. . 'Thirteen thousand in all' replied the Pandit. So no less than thirteen thousand copies of this book have been in circulation in different parts of Bengal, and assuming each copy to have been read by 8 or 9 persons about a lakh of educated people in Bengal will have read the book. Again, when recently Sir Harold Stuart Circulated a letter asking all Government officers to discuss politics with the public and to convince them that the wealth of the country was not being drained away under British rule, a Bengali personal assistant to one of the Divisional Commissioner of Bengal took a copy of 'Desher Katha' to his official superior, the Commissioner and said.—"Sir, I can find no answer to the allegations in this book. If you kindly read it through and let me know how I

am to defend Government against the allegations contained in it. I shall be most glad to repeat them for the benefiit of the public." So far as we are aware no such refutation was ever furnished by the Commissioner. It is with the object of suppressing disoffection that the Government is proscribing various books. But the question is whether disaffection is suppressed thereby. We could have appreciated the action of the Government if it had first published a refutation of 'Desher Katha' and then proscribed it, and we would have probably published that refutation in our paper in the interest of the public peace. But if instead of doing so Government merely pescribes a book on the ground of its seditions character people will of course bow down to the decision but will not be convinced of its Justice. To give one example, the first part of "Sipahi Juddher Itihash" by Babu Panchkari Banerji has been prescribed by Government on the ground of its being a seditions publication A history of the Sepoy war, however, by the late Babu Rajanikanta Gupta is permitted to be freely read, although in the opinion of many exparts the language of the latter book is stronger and more force full than that of Panch Kari Babu's book, and although in the latter book now where are the Sepoys condemned whereas in Panchkari Babu's book the Sepoys and the East India Company are both condemned. Nobody could see for what fault Panch Kari Babu's book was strangled, as it were. immediately on its publication and for what merit Rajoni Babu's book has been permitted to be published for this length of time. Panch Kari Babu prayed the lieutenant—Governor to point out the objectionable portions of his book so that he might expunge them and bring out a new edition, to which His Honour replied that he was not prepared to point out such passages.

Since it is a question of removing misconceptions from the public mind it behaves the Government to remove such of them as have been influencing the public mind for the last twenty years and creating disaffection there in. Without this real loyalty will not be reawakened in the public mind. There is no midway feeling between loyalty and disaffection. He who is not loyal must be disaffected and the line of argument that under mines loyalty is sure to evoke disoffection. So long as the facts, arguments and quotations adduced, in 'Desher Katha', in support of the exploitation of India by Englishmen are not refuted people will not be convinced. Specially the book has been widely circulated and discussed all over Bengal during the last five years. Its conclusions have been repeated in a thousand froms in the columns of newspapers and is 'Swadeshi' speeches with the result that they have struck their roots deep into the public mind.

Besides, 'Desher Katha'' abounds with quotations from writings in English. It has been proscribed, but not so Digby's book or O' Donnel's pamphlet. Will this have the effect of suppressing disaffection? You Englishmen have opened our eyes, spread education, provided for the wide circulation of newspapers and permitted free criticism of your actions and the effect of these meausres is not to be done away with the mere confiscation of publication. This repressive policy if long continued, may extort loyalty from fear but will never evoke loyalty from love. But if anybody has genius enough to refute the propositions and conclusions of 'Desher Katha' then people's minds may be disabused and they may become loyal. Sir Edward Baker is a man of genious. He may, it he chooses, accept our suggestions and set a stream of right-reasoning and right-feeling flowing over the country.

Let him for once make the attempt and thereby put an end to our misgivings and win for himself the position of a fore most Statesman "[২৬]

অনুরূপভাবে 'হিতবার্তা' পত্রিকা 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করার বিরুদ্ধে 'তীব্রভাষায় মন্তব্য করে লিখেছিল :—

The only book which now remains unforfeited is the Hindi edition of the 'Desher Katha' (Calcutta edition). 'Desher Katha', of course, contains matters relating to the administration of this country, which although true, may be disliked by the officials ; but what is there in Tilaker Makaddama for which it has been confiscated ? It gives only the life of Mr. Tilak and the details of his case, with an appendix containing the copy of papers fied by Mr. Tilak and their translation. If to write all this is sin, why was the case allowed to be published in the newspapers ? If it is criminal to praise Mr. Tilak, the Government officials should have an extensive jail to accomodate millions of his admirers.[২৭]

সখারামও সরকারী কর্তৃপক্ষের জঘন্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে হাইকোর্টে মোকদ্দমা জারি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবেদন হাইকোর্ট না মঞ্জুর করেছিল। হাইকোর্টে তাঁর আবেদন না মঞ্জুর হলেও তিনি 'ন্যায় সত্যের শাশ্বত আদর্শ' থেকে দূরে সরে যান্নি। সংসারের শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও তিনি এগিয়ে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে

২৬ Report on Native Papers in Bengal 1910, 8th October pp. 1171-72

২৭ Report on Native Papers in Bengal November 5, 1910 p. 1242

এগিয়েছেন সংগ্রামের দিকে। তাঁর কর্মসাধনায় একজন যথার্থ বিপ্লবীর জীবন আদর্শই দেখা যায়। জীবনের সংকটময়কালেও তিনি কোনদিন স্বীয় স্বার্থে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে কোন নীচ স্তরের ব্যক্তি গত সুযোগগ্রহণ করেন নি।

সখারাম জীবন সাধনার সূচনাতেই বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত ও উদ্দীপিত হয়েছিলেন। "কলকাতায় তিনি এই শতাব্দীর সূচনায় বহু বিপ্লবীদের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু।"[২৮]

২৮ দেশের কথা (মহাদেব প্রসাদ সাহা সম্পাদিত সম্পাদকের নিবেদন)

৫.

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন দ্বারা পরিকল্পিত 'বঙ্গভঙ্গ' আইন ঘোষণা বানচাল করার জন্য দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন গণ-সংগঠন অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার পক্ষে দেশের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট গণসংগঠন গুলির অবদান অন-স্বীকার্য। উদ্যোগী সংগঠনও সংস্থাগুলির মধ্যে 'আজীবনী সভা' 'অনুশীলন সমিতি' 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রয়াস সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি পায়। এই সমিতির অন্যতম কর্ণধার সতীশচন্দ্র বসু, স্বদেশের মুক্তি-কামনায় বাংলার যুবসমাজকে বিশেষভাবে প্রেরণা দান করেন।

সমিতির স্বতন্ত্র কর্মপদ্ধতি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। এই সমিতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু বাঙালী, জাতিকে শক্তিশালী করার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন। "জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির উদ্ভবও প্রতিষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে—তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ 'সকল ধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না', সমিতির মূল প্রে রণা যোগাইয়াছিল। যত-দূর জানা যায় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই সংঘের নামকরণ করেন 'ভারত অনুশীলন সমিতি।' পরে পি. মিত্র মহাশয় উহা সংক্ষেপে 'অনুশীলন সমিতি

করেন।"[২৯] এই অনুশীলন সমিতির কর্মসূচীর অঙ্গ স্বরূপ শারীরিক উন্নতিবিধানপ্রকল্পে, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তরবারি খেলা, মুষ্টি-যুদ্ধ, আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগ ছিল। শুধু মাত্র শারীরিক চর্চাই নয়, বিভিন্ন আলোচনার ব্যবস্থাও ছিল। মানসিক উন্নতির জন্য দেশ বিদেশের গ্রন্থ পাঠ, রাজনীতি, অর্থ-নীতি, স্বদেশের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সদস্যদের ওয়াকিবহাল করা হোত। এই পাঠচর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল অনুশীলন সমিতির ১০৮ নং সাকুলাররোডস্থ ভবনে। সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ও বিভিন্ন পাঠক্রমে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি সমিতিতে আলোচনার জন্যেই নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। এবং অনু-শীলন সমিতির বিবিধ ক্লাশের মধ্যে তিনি অর্থনীতির ক্লাশও করাতেন। সমিতিতে অর্থনীতির নিয়মিত ক্লাশ নিতেন, সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ও। ঠাকুর মহাশয় যে সময়ে নিয়মিত ক্লাশ নিতে পারতেন না। তখন তাঁর পরিবর্তে সখারামবাবুই সেই ক্লাশগুলো গ্রহণ করতেন। অনু-শীলন সমিতির পাঠকেন্দ্রে সখারাম বাবু যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করতেন তাই পরবর্তী কালে 'দেশের কথা' গ্রন্থ খানাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়েও তাঁর যে পরিমাণে জ্ঞান ছিল তা তৎকালীন অনেক বড় অর্থনীতিবিদের ছিল না। 'দেশের কথা' গ্রন্থখানাই তার প্রমাণ-"কর্তৃপক্ষ মুদ্রাবিষয়ক বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় গবর্ণমেন্টের কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ-স্বাচ্ছল্য ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষি ও শিল্প জীবিকে সেজন্য বৎসরে ২২ কোটী টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রৌপ্যের মূল্যের সহিত বিনিময়ের হার কমিয়া ১৩ পেন্সে একটাকা হইয়াছিল। অতঃপর

২৯ অনুশীলন সমিতির ইতিহাস :—জীবনতারা হালদার।

ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য ১৫ পেন্স স্থির করিয়া দেন।......

রৌপ্যের মূল্য হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যে রূপ কমিতেছিল যদি সেইরূপ কমিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে আমরা ১৩ পেন্সের জিনিস দিয়া প্রায় উনিশ আনা পাইতাম। পক্ষান্তরে ১৩ পেন্স মূল্যের বিলাতি জিনিস ১৵০ আনা দিয়া কিনিতে হইত বলিয়া সস্তা দেশীমালের কাটতি বাড়িত। রৌপ্যের মূল্য হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যতই কমিত, বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য ততই বাড়িত, দেশীয় শিল্পীগণ প্রতিযোগিতা করিবার ততই সুবিধা পাইতেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ উচ্চাহারে বিনিময়ের দর নির্দ্দিষ্ট ও স্থায়ী করিয়া দেওয়ায় এই সুবিধা হইতে দেশীয় কৃষি ও শিল্প জীবিরা বঞ্চিত হইল। পরন্তু তাহাদের প্রভূত ক্ষতি হইল। শুদ্ধ বর্হিবাণিজ্যেই তাহাদিগের ২২ কোটী টাকা লোকসান হইয়াছে, তাহার পরিমাণকে নির্দ্দেশ করিবে। ফলতঃ মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য নির্দেশ কোন ও ক্রমেই প্রকৃষ্ট অর্থনীতির অনুমোদিত নহে।" অনুশীলন সমিতিতে তিনি কি তাঁর এই অর্থনীতির গভীর জ্ঞানতত্বের বিশ্লেষণ করতেন না? তিনি তাঁর নিজস্ব বিষয় ইতিহাসের প্রতি ও যথেষ্ঠ যত্নবান ছিলেন। 'শিখ অভ্যুত্থান', 'ফরাসী বিপ্লব,' 'সিপাহী যুদ্ধ,' প্রভৃতি ইতিহাসের প্রতিটি বিষয় ধৈর্য সহকারে ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন। প্রতিটি বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে। অনুশীলন সমিতির পাঠ কেন্দ্রে তিনি ইতিহাসের প্রতিটি বিষয় ধৈর্য সহকারে ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন। অনুশীলন সমিতিতে তাঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিঃসন্দেহে দেশ সেবায় নিবেদিত পৌরুষত্বেরই স্বাক্ষর। যে পৌরুষ শিক্ষা বিস্তারে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় অনন্যতার প্রতীকরূপে সর্বত্র নায়কের পদ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হোননি। সেই পৌরুষই তো দ্বিধাচিত্তে তরুণমনে জ্বালাতে পারে বিপ্লবের বহ্নিশিখা। তিনিই

শিবাজী উৎসব কেন্দ্র করে ১৯০৩ সালে 'শিবাজীর মহত্ব; শিবাজীর দীক্ষা, গ্রন্থখানা রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। যুব জীবনের কাছে মারাঠা নায়কের মহান ত্যাগের আদর্শ প্রচার সখারামের জীবন চর্যার বেদীমূলে অন্যতম সক্রিয় প্রেরণা ছিল। যে প্রেরণাতে ভারতবর্ষ তথা বাঙালীজাতি সক্রিয় সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিপ্লববাদের চেতনায় জাতীয় জীবনে বিশেষ জাতীয়তাবাদ ও শিবাজী উৎসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতিকে স্বদেশ সেবার প্রেরণা দান। বাঙালী জাতি শিবাজী উৎসবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় জাগরণের অন্যতম মহান দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী' কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতিকে এক নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাঙলার ও মারাঠার রাজনৈতিক যোগসূত্রের কারণ নানাভাবে সংগ্রথিত ছিল। কিন্তু সখারামের নবতম প্রচেষ্টাতেই মারাঠা জাতির সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির একাত্মবোধ ও ঐক্য সাধনের সংযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠীত হয়েছিল। আমরা জানি শিবাজী যে মহান রাষ্ট্র গঠন কর্তা ছিলেম তা মহারাষ্ট্রের রক্ত দিয়ে গড়া জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি। ইংরেজ শক্তির প্রবল পরাক্রমে মারাঠা সাম্রাজ্যের ভাঙন ও ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধে নানাসাহেব, লক্ষীবাঈ-তাঁতিয়া টোপির পতনের সঙ্গে মারাঠা জাতি স্বাধীনতা হারালেও, মারাঠা শক্তি কোনদিন নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়নি। তাঁরা স্বাধীনতা হীনতার জ্বালা মর্মে-মর্মে অনুভব করছিলেন। দাসত্ব শৃঙ্খল তাদের মুক্তমনে বেশীদিন অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। বরং মনে প্রাণে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁদের গণ সংগ্রাম ছিল সদা-সক্রিয়। স্বাধীনতা স্বপ্নে তারা মনে মনে মুক্ত পক্ষ পক্ষীকুলের ন্যায় ইংরেজ অধীনস্থ হয়েও ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলেন। কিন্তু পারৎ পক্ষে বাঙালী জাতি ইংরেজর দাসত্ববৃত্তকেই মনে প্রাণে, গ্রহণে আত্মপ্রসাদলাভে

ঈশ্বারানুগ্রহের অপেক্ষাতেই বসেছিলেন। কিন্তু সখারাম ঈশ্বরের করুণা প্রার্থী না হয়ে বাস্তব যুক্তিনিষ্ঠ পথে বাঙালী ও মারাঠা শক্তির আত্মিক ঐক্যের যোগসূত্রকে ব্রতবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। যদি ও এই মহা-মিলনের উদ্যোক্তা ছিলেন 'লাল, বাল, পাল,' খ্যাত তিন মনীষী। তিন প্রধানের এক প্রধান ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক। তিলকের নিকটেই সখারাম লাভ করেছিল স্বাদেশিকতার শিক্ষা এবং কঠোর অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা। যেমন স্ব দেশের জন্যে হিন্দু মেলার আবির্ভাব হয়েছিল, হিন্দু তরুণদের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াসে, ঠিক তেমনি সখারাম কৃত শিবাজীর উৎসবও বাঙালী জাতিকে স্বদেশের হিতার্থে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি কোলকাতায় শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেছিলেন (১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে)। তিনি কোলকাতায় অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবের উৎযাপনের কালে বলেছিলেন "তোমরা নিজ কর্তব্য পালন করিবে না, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর উন্নতি কল্পে সর্ব্বস্বপর্ণে আত্ম বিসর্জন করিবেন না। শুদ্ধ গভর্ণমেন্টের দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমাদের উন্নতি তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভণ্ডামি ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক' সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া একমনে, একধ্যানে উদ্দেশ্য সং-সাধন পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত অক্ষুব্ধ ও অসঙ্কিশঙ্কচিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে।" সখারামের এই আহ্বান অসফল হয়নি। তাঁর ডাকে দেশ বাসীর যথার্থ সাড়া পড়েছিল। বাঙালীর সঙ্গে মারাঠা জাতির আত্মিক-যোগ সম্পর্ক, ভারতীয় স্বাধীনতার ঐক্যের প্রশ্নে একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

৬.

ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচেষ্টা, দেশ-সেবার আর একটি মহান আন্দোলনের আবির্ভাব ১৯০৪ সালের শেষার্ধে ঘটে। স্বদেশী যুদ্ধে ভারত ভাবাবেগের আদর্শ থেকে বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে কর্মের মাধ্যমে দেশের মুক্তি সাধনাকেই একমাত্র সফল সাধনা বলে মেনে নেয়। ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৪ সাল জাতীয় জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের অখণ্ড জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠীত করা। এই স্বদেশী সাধনার ঐক্যে সুরেন্দ্র নাথ সেই কথাই বলেছিলেন "What ever might be our difference in respect of race and language or social and religous institutions, the people of India could combine and write for the attainment of there common political ends. স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে আর একটি কামনা ছিল দেশকাল পাত্র সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে স্বাধিকারবোধের দাবীকে জাগ্রত করা। সেই সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের দীপ্ত-বাণী কে আকাশ বাতাস মুখরিত করে জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশীকতার বীজ বপন করা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ স্বদেশী আন্দোলন একটি বাস্তব অনুপ্রেরণা। যে প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত লব দীক্ষা।

কিংবা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার্য্যের অনুপ্রেরণা দানে কান্ত কবিও লিখেছিলেন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই
মা যে মোদের দীন দুঃখিনী তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক গণজীবনে স্বদেশী আন্দোলন একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলতেই হয়। যার সুদূর প্রসারী চেতনার প্রকাশ ঘটে—"যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ," "ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ," "স্বদেশী বস্ত্রালয়," "লক্ষ্মীভাণ্ডার," "ডন সোসাইটী" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। পূর্বেই বলেছি স্বদেশী আন্দোলনের ব্রত পালনে জাতিকে অখণ্ডসত্তায় পরিণত করার মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল সন্নিকট হয়ে ওঠে। স্বদেশ চেতনার সম্মেলকরূপে এই স্বদেশী আন্দোলনকেই ঐতিহাসিকরা যথার্থ জাতীয় জাগরণের প্রস্তুতিকালরূপে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় জাগরণের যে স্রোত ১৯৪৭ সাল পূর্ণ বেগে প্রবাহিত হইতেছিল তাহার প্রথম উল্লেখ্য যোগ্যধারা ১৯০৫ সালেই আমরা দেখিতে পাই। এই জন্য ভারতের ইতিহাসে ইহা চিরদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ও নবযুগের অগ্রদূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গচ্ছেদ আইন বলবৎ এর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে সমগ্র জাতির মনে অগ্নিৎপাৎ সৃষ্টি করে। দেশে দেশে এই বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুক্তিপ্রিয় জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জাগ্রত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জেহাদ ইংরেজ শক্তির সমর সম্মুখেও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেনি। মুখোমুখী সংঘর্ষেও তাঁদের প্রাণের ভয় ছিল না। লক্ষ পরাণে শংকা না মানি ১৯০৫ ৭ই আগষ্ট কোলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেই প্রথম বিলাতী বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ নীতি গৃহীত হয়েছিল।

এই বয়কট নীতির দৃঢ় সমর্থকদের মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্করও ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবক্তা। বর্জন-নীতির প্রণেতা ছিলেন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে দেশবাসী স্বদেশের বাণীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বয়কট প্রস্তাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহিত স্রোতে দেশ-বাসীর সঙ্গে দেশের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সভা ও সমিতিতে জ্বালাময়ী ভাষণদানে স্বদেশের মুক্তি কামনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশ সমাজপতি প্রমুখের মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রদীপ্ত ভাষণ সেকালে জনমানসে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে বিস্ময় না হয়ে পারা যায়নি। স্বদেশের সেবায় এত বড় মহৎ প্রাণের আত্মোৎসর্গ ইতিহাসে বিরল।

স্বদেশী আন্দোলন কেবলমাত্র হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনা নয়। হিন্দু মুসলমানের যৌথ প্রয়াসই এই আন্দোলনের কওম। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে, বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগেই স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট কার্জন সাহেব চিন্তায় পড়ে-ছিলেন। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম শক্তির সমন্বয় ঐক্যকে খর্বিত করার অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণে তখনকার মুসলিম প্রধান শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কৌশলে বুঝিয়ে বৃটিশ সরকার তাঁর ভেদনীতি বাস্ত-বায়িত করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশের এই ভেদ-নীতির বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ও রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন সম্প্রদায়ই বৃটিশ সরকারের, এই ভেদ নীতিকে সমর্থন জানাতে পারেননি। যাঁর ফলশ্রুতিতে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে যুক্ত আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'History of the

freedom movement in India' গ্রন্থ থেকে জানা যায় "At the early stages of the anti Poilitism movement it was supported by the Muslims of East Bengal.' দেশের মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণ ইতিহাস বিস্মৃত নয়। কংগ্রেসে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবদান কোন অংশে কম ছিল না "সরকারী দপ্তরে বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনে বা স্বদেশী আন্দোলনের যে নথীপত্র আছে তাতে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিপুল-ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন।

জেলা ওয়ারী সভায় যে হিসাব দেওয়া আছে তাতে ময়মনসিংহ ১০০, ঢাকা ৭৫, কুমিল্লা ৪০, কলিকাতা ২০০ ফরিদপুর ৫০টি সভা হয় বলে জানা গেছে। এইসব জেলায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন ও মুসলিম জননেতারা এই সভাগুলিতে ভাষণ দিয়েছিলেন।" প্রসঙ্গতঃ ১৯০৬ সালের ১৬ই এপ্রিলে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সম্মেলন বৃটিশ শাসকদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গের *ব্যাপারে বৃটিশশাসক অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। বরিশালের উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজ করতে নেতৃবর্গকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল তা সত্ত্বেও নেতৃবর্গ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচত হয়েছিলেন এ. রসুল। এই সভায় দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকুমার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে সখারাম গণেশ দেউস্করও জ্বালাময়ী ভাষণ দানে জনগণকে উত্তেজিত করে তুলে ছিলেন। বঙ্গভঙ্গর বিরুদ্ধে এই ভাষণও সমাবেশসমূহ ঐতিহাসিক অক্ষয় কীর্তিত। স্বদেশী আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণই

শেষ কথা নয়। স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট অন্দোলনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে স্বাধীনতার মুক্তি কামনায় মুসলিম ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার অবদান যথেষ্ট ছিল। মুসলমান সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বৃটিশ সরকারের ভেদনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তবে ১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ আব্দুল হালিম, মৌঃ আব্দল কাসেম, মিঃ মুজিবর রহমান মিলিত উদ্যোগে 'দি মুসলমান' নামক একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকার মুখ্য ভূমিকাই ছিল মুসলিম জনসাধারণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপিত করা এবং স্বদেশী আন্দোলনে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সমাজ ও দেশহিতকর বিষয়গুলি প্রচার করা। তাই 'দি মুসলমান' পত্রিকা জাতীয়তাবাদী প্রেরণাতেই বলতে পেরেছিল—" It is our economical and political situnation that makes all of us Indians and so far as we have to live our practical lives, we are Indians first and Mahra-medans after words.

(December 14, 1906)

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংবাপত্রের অবদানও কোন অংশে পশ্চাদপদ ছিল না। তদানীন সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও পত্র পত্রিকার ভূমিকায় সক্রিয় স্বাধীনতাকামী পত্র পত্রিকার মধ্যে দেখা যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের উদ্যোগে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী ঘটনা। স্বদেশী আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের রক্ত-রাঙা পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দেশের নেতৃবৃন্দ। সেইসঙ্গে বিশেষ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যই এই পত্রিকাগুলোর জন্ম হয়েছিল বলা যেতে পারে। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কাশী কংগ্রেসে

তিন মাসের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রচারের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার নায়ক ও কর্ণধার বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর থেকে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কড়া প্রবন্ধের চড়া সুরের জন্য 'যুগান্তর' এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়েছিল। 'যুগান্তর' প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখেছিলেন যে "বাংলার সে এক অপূর্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। লক্ষ লক্ষ পরানে শঙ্কা না মানে না রাখে কাহারো ঋণ' এইভাবে উদ্দীপ্ত জনগণ যুগান্তরের আদর্শে দলে দলে গ্রাহক শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিলেন। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজার ঠেকিল। যুগান্তরের মুক্তিকামী বাণী প্রচারের সঙ্গে সখারামের বিপ্লবী চেতনাও আদর্শ সংযুক্ত হয়েছিল। যুগান্তরের পাতায় সখারামের ঋজু লেখনী শক্তির প্রকাশে পাঠক সাধারণ চমৎকৃত ও উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারেনি। সেইসঙ্গে যুগান্তর গোষ্ঠির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। তাঁর সেই সময়কালের লেখনী মধ্যে 'মুক্তি কোন পথে?' বিশেষভাবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'হিন্দুজাতি কি ধ্বংসন্মুখ?' এগ্রন্থ খানাও প্রতিবাদের মুখর দলিল। এই গ্রন্থখানা কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জীর হিন্দুজাতির অধঃপতনের ওপর লেখা ইংরেজী গ্রন্থ "A Dying Race" সে কালে দারুন বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থখানা কর্নেল মুখার্জীকে খ্যাতি, অখ্যাতি দুই-ই এনেদিয়েছিল। কর্নেল মুখার্জী সেকালে চিকিৎসা বিদ্যায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি হিন্দুধর্মের সমস্ত কুসংস্কারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়ে "A Dying Race" গ্রন্থটি

রচনা করেছিলেন। আর এই গ্রন্থটি রাতা-রাতি জন সমাজে বিখ্যাত হয়ে পড়ে—সখারাম গণেশ দেউস্কর 'হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ? এই নাম দিয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখে সমালোচনা করেছিলেন।

স্বল্পজীবী সখারাম গণেশ দেউস্কর জীবনযজ্ঞে যে ব্রত ধারণ করে-ছিলেন তা মূলতঃ মারাঠা ও বাঙালীর জীবন চর্যায় এক সেতুবন্ধ স্বরূপ। সেকালের বাঙালী, ভারতের তিনজন বিপ্লবী সন্তানের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, যে শ্রদ্ধায় কোন খাদ ছিল না। বাংলার বীর সন্ন্যাসী বিকোনন্দের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ও সখারামের অন্তরঙ্গ পরিচয় সে যুগের একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। সখারাম স্বামীজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বলেছিলেন যে—"স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরে পরাধীনতার জ্বালা ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করা। বাস্তবিক পক্ষে স্বামীজীর কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানই ভারতবর্ষের তরুণগণকে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনে অনুপ্রাণিত করে।'

ভারতের বিপ্লব সাধনা ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ১৯৩৬ সালের তীব্র গতিবেগে সারা দেশ জুড়ে ভারত ছাড় আন্দোলন সুসংহতরূপে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ও যুদ্ধের সংগঠিতরূপ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সখারাম গণেশ দেউস্কর একটি গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আজীবন স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষ একদিন স্ব-মহিমায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেই। তিনি সমগ্র জীবনই স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে

নিঃসন্দেহে বলা চলে "সখারাম গণেশ দেউস্কর এই চেতনারই অগ্রজ পুরুষ।" তিনি ভারতে যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদের প্রেরণা, সাংবাদিকতার যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন তা ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অমর অক্ষয় হয়ে থাকবে। 'অনুশীলন সমিতি' 'স্বরাজ আন্দোলন' বৈপ্লবিক যুগান্তর দলের গঠনমূলক কাজে সখারামের মতো অগ্রনী পুরুষ সেকালে বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর বিপ্লব সাধনার সঙ্গে তাঁর অধিতবিদ্যা ও বুদ্ধির বিকাশেই তিনিই প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'স্বরাজ' শব্দ ও অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীঅবিন্দ লিখেছেন যে—'The word 'SWARAJ' was first used by the Bengali-Maratha publication Sakharam Ganesh Deuskar writen of 'Deskher Khatra' a book compiling all the details of Indian's economic servitude which had an enormous influence on the young men of Bengal, and helped to turn them into revolutionaries. The world was taken up as thir ideal by the revolutionary party and popularised by the vernacular paper 'Sandhya' edited by Brahmabandhab Upadhyaya; it was caught hold by Dadabhai Naoroji at the Calcutta Congress as the equivalent of colonial Self-government."[৩০]

স্বাধীনতার অসামান্য চিন্তানায়ক, আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক, কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিক, নির্ভীক সম্পাদক, শ্রীঅরবিন্দ, সহযোগী লোকমান্য তিলকের শিষ্য মনীষী সখারামের মহত্তর জীবন সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়নি। দুঃখ, দারিদ্র্য, নানাঘাত, প্রতিঘাত সখারামের জীবনে এনে দিয়েছিল এক দুঃসহ যন্ত্রণাবোধ। যে যন্ত্রণাবোধে তাঁর দীর্ঘকায় শরীর দিন দিন ভেঙে পড়েছিল। দুরন্ত কালব্যাধির আক্রমণ তাকে সংসারে বেশীদিন স্থায়ী হতে দেয়নি। পত্নী ও পুত্রের অকাল বিয়োগ ব্যথা জীবনকে এক চরম দুর্বিসহ করে

৩০ Sri Aurobindo on himself and on the mother at P. 30

তোলে। চরম-মৃত্যুই তাঁকে দিয়েছিল দিব্যলোকের সন্ধান। ১৯১২ সালের ২৩শে নভেম্বর দেওঘরের করো গ্রামের গৃহে তিনি মাত্র ৪৬ বছর বয়সে অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বেদনার্ত বাঙালী অশ্রুরুদ্ধ আবেগে কেঁদেছিলেন। সখারামের একান্ত 'গুণগ্রাহী সুহৃদ 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে লিখেছিলেন "পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেঁউস্কর আর ইহ জগতে নাই। ইনি দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বানীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদ-পত্রের সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। সখারাম বাবু কর্মী ছিলেন—ইনি কর্ম করিতেন, কিন্তু কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙালীকে আপন করিয়া লইয়া ছিলেন। এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। আমরা সে ক্ষতিতে মর্মাহত হইয়াছি।···

সাহিত্য সেবীর চিরন্তন অতিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চির-জীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সে দারিদ্র্যের যাতনাও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রভাতে তিনি ধরার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছেন। ভগবান কর্ম-ক্লান্ত, পথ শ্রান্ত পথিকের কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাহাকে শান্তিদান করুন।"

তাঁর অকাল বিয়োগে বাঙলা সাহিত্যে তথা ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে তিনি যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। তা তদানীন্তন সংগ্রামী বাঙালী মাত্রই মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও জাতীয় জাগরণের ভূমিকার সঙ্গে তাঁর গঠনমূলক কাজের অগ্রনী

ভূমিকায় তাঁর অনন্যতার চেতনা, ইতিহাস থেকে কোন দিন মুছে যাবে না। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁর কর্মযজ্ঞকে যথার্থ মর্যাদায় স্মরণ করি না। তার অপরিশোধ্য ঋণের কথা কেউ স্মরণ না করলেও, তাঁর কর্মময় জীবন ইতিহাসের মূল্যায়ণ ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে থাকবে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। সখারামের শতবার্ষিকী পূর্তি-উৎসবে, 'স্মৃতিতর্পণে' শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহাশয় তাঁর অবদান সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ণ করেবলেছিলেন—"সখারাম গণেশ দেউস্কর' মহাশয়ের দানের কথা স্মরণ করতে গেলেই তাঁর নিকট আমাদের জাতীয় ঋণের কথা স্বীকার করতে হয়। এই জাতীয় ঋণ শোধ [illegible]ার নয়—শুধু সেই ঋণ স্বীকার করবার স্মরণ ও মনে প্রাণে [illegible] লব্ধি করবার—যেমন পিতৃঋণ অপরিশোধ্য তাই করি পিতৃ-[illegible]ণ—তেমনি এ জাতীয় ঋণগ্রস্ত থেকে তর্পণ করবো...দেউস্কর মহাশয়ের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই। প্রণাম জানাই আমৃত্যু তাই জানাবে,—"ভূয়োহপি নমো নমস্তে।"[৩১]

৩১ স্মৃতি-তর্পণ : নলিনী কিশোর গুহ (শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

পরিশিষ্ট—১

সখারাম গণেশ দেউস্কর রচিত বাংলা গ্রন্থ
ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

ধর্ম ও পুরাণ গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
এটা কোন যুগ ?	২-৯-১৮৯২
রাষ্ট্র ও সমাজচেতনা	
দেশের কথা-১ম ভাগ	১৬-৬-১৯০৪
—পরিশিষ্ট	১৩-১০-১৯০৭
কৃষকের সর্বনাশ	
(দেশের কথা হ'তে সংকলিত)	২৮-৭-১৯০৪
তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত	৪-১০-১৯০৮
বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?	১০-১০-১৯১০
ইতিহাস ও জীবনালেখ্য	
মহামতী রাণা ডে	২৩-১-১৯০১
ঝাঁশীর রাজকুমার	২৭-১২-১৯০১
বাজী রাও	২৪-১-১৯০২
আনন্দী বাঈ	২৫-৩-১৯০৩
শিবাজীর মহত্ত্ব	জুলাই ১৯০৩
শিবাজীর দীক্ষা	৭-৯-১৯০৪
শিবাজী	১-৬-১৯০৬

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা
(ঐতিহাসিক)

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশ কাল
বাজীরাও ও মস্তানী	'সাহিত্য'	১২৯৯ অগ্রহায়ণ+চৈত্র।
পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ	'সাহিত্য'	১২৯৯ ফাল্গুন।
ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী	'সাহিত্য'	১৩০০ আষাঢ়+ভাদ্র।

শঙ্করাচার্য	'ভারতী'	১৩০০ মাঘ।
শিবাজীর স্বার্থত্যাগ	'ধরণী'	১৩০১ ফাল্গুন।
নারায়ণ রাও এর বাখর	'সাহিত্য'	১৩০২ শ্রাবণ+আশ্বিন।
আফজল খাঁর অভিযান	'সাহিত্য'	১৩০২ আশ্বিন।
পালুকেশ্বর	'ভারতী'	১৩০৪ বৈশাখ।
মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ	'সাহিত্য'	১৩০৪ পৌষ।
সমর্থ রামদাস স্বামী	'সাহিত্য'	১৩০৫ অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন।
আওরঙ্গজেবের ধর্মভাব	'সাহিত্য'	১৩০৬ আশ্বিন।
ভাস্করাচার্য	'সাহিত্য সংহিতা'	১৩০৭ আষাঢ়।
ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা	'ভারতী'	১৩০৭ মাঘ।
গ্রীক জাতির স্বাধীনতা-লাভ	'প্রদীপ'	১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ।
ভারতে আরাবী	'বঙ্গ দর্শন'	১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ।
শিবাজী প্রসঙ্গ	'সাহিত্য'	১৩১২ শ্রাবণ।
রাজকৃষ্ণরাও খটাও কর	'সাহিত্য'	১৩১৪ ফাল্গুন।
প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক	'বঙ্গ দর্শন'	১৩১৫ চৈত্র।
মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার	'সাহিত্য'	১৩১৬ শ্রাবণ।
গুজরাটে মহারাষ্ট্র অধিকার	'বঙ্গদর্শন'	১৩১৬ ফাল্গুন।
ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ	'বঙ্গদর্শন'	১৩১৭ বৈশাখ, আষাঢ়।
বাজীরা ও মস্তানী	'আর্য্যাবর্ত,	১৩১৭ বৈশাখ।
পৃথ্বীরাজ-রসো	'সাহিত্য'	১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ।

রাষ্ট্র ও সমাজচেতনা

প্রাচীন মহারাষ্ট্র	'সাহিত্য'	১৩০০ পৌষ।
পূজার আলোচনা	'সাহিত্য'	১৩০১ জ্যৈষ্ঠ।
সুরাপান (শাস্ত্রীয় বিচার)	'ভারতী'	১৩০৩ আষাঢ়।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়	'সাহিত্য'	১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।
ব্রহ্মদেশের আচার ব্যবহার	'সাহিত্য সংহিতা'	১৩০৭ শ্রাবণ।
ভূষণ	'প্রদীপ'	১৩০৯ শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ।
ভারতে শক-শোণিত	'সাহিত্য'	১৩০৮ আষাঢ়।
মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত	'সাহিত্য'	১৩১৮ মাঘ।

ধর্ম ও পুরাণ

কৃষ্ণবতার কোন যুগে ?	'বেদব্যাস'	১২৯৮ আশ্বিন, পৌষ।
জয়দ্রথ বধ	'প্রতিভা'	১২৯৯ ভাদ্র, আশ্বিন।
শাস্ত্রের অশুদ্ধ অনুবাদ	'প্রতিভা'	১২৯৯ ভাদ্র, আশ্বিন।
যুধিষ্ঠির আর্বিভাব কাল	'সাহিত্য'	১৩০০ আষাঢ়, ভাদ্র।
মনুপোক্ত সনাতন ধর্ম	'ধরণী'	১৩০১ ভাদ্র।
বৈদিক আলোচনা	'ভারতী'	১৩০২ অগ্রহায়ণ।
কিষ্কিন্ধ্যা	'ভারতী'	১৩০৬ ভাদ্র।
বোপদেবের পরিচয়	'সাহিত্য'	১৩১৩ ভাদ্র।
সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স	'আর্য্যাবর্ত্ত	১৩১৭ শ্রাবণ।

ভাষা ও সাহিত্য

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব	'সাহিত্য'	১২৯৯ বৈশাখ।
মহারাষ্ট্র সাহিত্য	'সাহিত্য'	১৩০১ বৈশাখ, শ্রাবণ।
মহারাষ্ট্র সাহিত্য	'সাহিত্য'	১৩০২ বৈশাখ।
মহারাষ্ট্র সাহিত্য	'সাহিত্য'	১৩০৫ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, চৈত্র।
বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি রহস্য	'ভারতী'	১৩০৬ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ।
আন্ধ্র সাহিত্য	'সাহিত্য সংহিতা'	১৩০৮ ভাদ্র, পৌষ।
মহারাষ্ট্র সাহিত্য	'সাহিত্য'	১৩০৬ চৈত্র।

পরিশিষ্ট—২

সখারাম গণেশ দেউস্করের জীবন ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৫৭
	১০ই মে সিপাহী বিদ্রোহ।
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'এর প্রতিষ্ঠা।
	১৩ই জুন লর্ড ক্যানিং কর্তৃক সংবাদপত্রের উপর দমননীতির প্রয়োগ।
	৪ঠা জুলাই স্যার হেনরি লরেন্স' এর মৃত্যু।
	পামার স্টোনের ভারত বিল।
	অগস্ট কোম্‌তের মৃত্যু।
	দাশরথি রায়ের মৃত্যু।
	প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রকাশ।
	ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকাশ।
	বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
	১৮৫৮
	ইংলণ্ডের রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ এবং ঘোষণা পত্রের প্রকাশ।
	ভারতের প্রথম ভাইসরয় পদে লর্ড ক্যানিং এর নিয়োগ।
	কোর্ট মার্শাল এর প্রাণদণ্ড।

সমকালীন ঘটনাবলী

তাঁতিয়া টোপির বিরুদ্ধে যোরতর সংগ্রাম তাঁতিয়ার পরাজয়।

'ইণ্ডিয়া কৌন্সিল' স্থাপন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম পত্র' এর প্রকাশ।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রকাশ।

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'এর প্রকাশ।

১৮৫৯

কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু।

প্রথম বাংলা প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতার' প্রকাশ।

১৮৬০

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের প্রকাশ।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' প্রকাশ।

১৮৬১

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার, প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপন।

সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর মৃত্যু।

ইনডিয়ান কাউনসিল এ্যাক্ট অনুমোদন।

জীবনপঞ্জী

১৮৬৯

১৭ই ডিসেম্বর সখারামের জন্ম।

সমকালীন ঘটনাবলী

১৮৬২

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম।

১৮৬৩

বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা।

প্রথম মফঃস্বল পত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রকাশ।

১৮৬৪

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

১৮৬৫

ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সরাসরি টেলিগ্রাফ সংযোগ স্থাপন।

নবগোপাল মিত্র কর্তৃক 'পেট্রি-য়টস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন

১৮৬৬

ভারতে 'রয়টার'এর প্রথম কার্যালয় স্থাপন।

১৮৬৭

নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মেলা'র সূচনা।

১৮৬৮

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যু।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক ডঃ স্মিথ কর্তৃক ভর্তুকী লাভের সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখান।

১৮৬৯

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা।

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	সুয়েজ-খাল খনন ও জল পথ উন্মোচন।
	বঙ্কিমচন্দ্রের 'বি. এল. পরীক্ষায় সাফল্য।
	১৮৭০
	রাজদ্রোহ আইন প্রবর্তন।
	কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু।
	অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট জারী।
	চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম।
	১৮৭১
	কলিকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি নরম্যান কে হত্যা।
	১৮৭২
	সাধারণ বঙ্গ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা
	'বঙ্গদর্শন' এর প্রকাশ।
	আন্দামানে ওহাবী আন্দোলনের জনৈক বন্দী দ্বারা লর্ড মেয়ো'র হত্যা।
১৮৭৩	১৮৭৩
মাতৃ বিয়োগ	জন-ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু।
	মধুসূদন দত্তের মৃত্যু।
	অমৃতসরে 'সিং সভা'র প্রতিষ্ঠা।
	দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু।
	১৮৭৫
	সংবাদ পত্রের ডাক মাশুলের হার হ্রাস।
	১৮৭৬
	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়শন' প্রতিষ্ঠা।
	'ভারত সভা-সংস্থাপন'।
	মাদ্রাজে 'নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন' গঠন।
	পুনায় 'সার্বজনীক সভা'র প্রতিষ্ঠা।
	'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ'।
	১৮৭৭
	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ।
	'প্রেস কমিশন' গঠন।
	সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, গঠন।
	১৮৭৮
	'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি।
	ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রেস অ্যাক্ট জারি।
	সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা।
	১৮৮০
	পাঞ্জাবে শিখ আন্দোলন।
	ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় পদে লর্ড রিপণের নিয়োগ।
	১৮৮১
	বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এর রচনা আরম্ভ।

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	প্রথম রাজদ্রোহী পত্রিকা' বঙ্গবাসী'র প্রকাশ।
	'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রত্যাহার।
	১৮৮২
	'হানটার কমিশন' নিয়োগ।
	হেষ্টিং সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-যুদ্ধে জয়।
	১৮৮৩
	'ইলবার্টবিল' এর প্রকাশ।
	সুরেন্দ্র নাথের বিচার।
	ভারতে প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ।
	১৮৮৪
	গভর্ণর ও ভাইসরয় পদে ডাফ্-রিণের নিয়োগ।
	গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য লীলা' নাটকের অভিনয় ও প্রকাশ।
	১৮৮৫
	ভারতের জাতীয় কংগেস প্রতিষ্ঠা।
	ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন।
	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।
	ভিক্টর হুগোর মৃত্যু।
	১৮৮৬
	বৃটিশ ইণ্ডিয়াঅ্যাসোসিয়েশন গঠন। প্লাওডেন সাহেবের কাশ্মীরে রেসিডেন্ট নিযুক্ত।

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৮৭ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে উৎসব। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' এর গঠন।
	১৮৮৯ অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট প্রবর্তন। বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জিবচন্দ্রের মৃত্যু।
১৮৯০ এণ্টাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	**১৮৯০** 'সাহিত্য' মাসিক পত্রের প্রকাশ।
	১৮৯১ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। 'এজ অব কনসেনট অ্যাক্ট' ও 'কাউন্সিল অ্যাক্ট' জারি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু।
১৮৯২ ২ রা সেপ্টেম্বর 'এটা কোন যুগ' গ্রন্থের প্রকাশ।	**১৮৯২** বঙ্কিম চন্দ্রের 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ।
১৮৯৩ শিক্ষিকতার কাজে যোগদান।	**১৮৯৩** চিকাগো শহরে 'Parliament of Religions' নামক সভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি রূপে ভাষণ দান।

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৯৪
	বঙ্কিমচন্দ্রের সি. আই. ই উপাধি লাভ।
	ভূদেব মুখার্জীর মৃত্যু।
	বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু।
	১৮৯৬
	পুণায় 'গো-বধ নিবারণী সভা'র সূচনা।
	পুণাতে র‍্যানড ও লেফটন্যাণ্ট, আয়ার সট্ হত্যা।
১৮৯৭	**১৮৯৭**
'হিতবাদীর' সাংবাদিক হিসাবে যোগদান।	তিলকের ১৮ মাসের কারাদণ্ড।
'হিতবাদীর' সহযোগী সম্পাদকের কর্মভার গ্রহণ।	**১৮৯৮**
	রাজদ্রোহ আইন সংশোধন ও শক্তিবৃদ্ধি।
	পোষ্ট অফিস আইন জারি।
	১৮৯৯
	লর্ড কার্জনের ভারত আগমন।
	১৯০০
	বঙ্গভঙ্গ ও উগ্রজাতীয়তা বাদের অভ্যুত্থান।
১৯০১	
'মহামতী রাণা ডে' গ্রন্থের প্রকাশ।	
'ঝাঁসীর রাজকুমার' গ্রন্থের প্রকাশ।	

জীবনপঞ্জী

১৯০২

'বাজীরাও' এর প্রকাশ

শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন (কলকাতায়)

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপ্লব ধর্মী আখড়ায় যোগদান।

১৯০৩

আনন্দী বাঈ গ্রন্থের প্রকাশ ও 'শিবাজীর মহত্ব' গ্রন্থের প্রকাশ বিনামূল্যে বিতরণ।

১৯০৪

'শিবাজীর দীক্ষা' নামক গ্রন্থের প্রকাশ ও বিনা মূল্যে বিতরণ।

'দেশের কথা' হতে সংকলিত।

'কৃষকের সর্বনাশ' গ্রন্থের প্রকাশ।

'দেশের কথা'র প্রথম ভাগের প্রকাশ।

১৯০৫

বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দান।

কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় আমন্ত্রিত ও যোগদান।

সমকালীন ঘটনাবলী

১৯০২

অনুশীলন সমিতি গঠন।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু।

লর্ড কার্জন দ্বারা University Commission এর গঠন।

১৯০৩

University Act. Bill পাশ।

১৯০৪

টাউন হলে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী সভা। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রকাশ

University Act. প্রবর্তন।

১৯০৫

বঙ্গ ভঙ্গ ঘোষণা।

বন্দে মাতরম্ সংগীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি।

ছাত্র দমন এর জন্য কার্লাইল সার্কুলার জারি।

প্রথম বয়কট আন্দোলনের সূচনা।

অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠন।

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
	London এ 'Indian Home Rule Society'র প্রতিষ্ঠা।
১৯০৬	১৯০৬
'শিবাজী' গ্রন্থের প্রকাশ।	গোল দীঘিতে বিদেশী কাপড়ের বহ্নি উৎসব। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'শিবাজী' কবিতাটি প্রকাশ। কংগ্রেসের স্বরাজ ঘোষণা। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'এর প্রতিষ্ঠা। মুসলীম লীগের জন্ম। 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রকাশ।
১৯০৭	১৯০৭
'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ। 'দেশের কথা'র পরিশিষ্টাংশের প্রকাশ। 'যুগান্তর' পত্রিকার পরামর্শদাতার পদ মর্যাদা লাভ।	সম্পাদক কালি প্রসন্ন কাব্য-বিশারদের মৃত্যু। জনসভা নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স ও আইন পাশ। 'সন্ধ্যা'র সিডিশান মামলার সূচনা। লাজপৎ রায়, অজিত সিং বহিষ্কৃত। যুগান্তর পত্রিকার অফিস তল্লাসী।
১৯০৮	১৯০৮
'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্রের' প্রকাশ। হিতবাদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আদর্শ-	মজঃফরপুরে কেনেডি হত্যা। মাণিকতলায় বোমা কারখানা আবিষ্কার।

জীবনপঞ্জী	সমকালীন ঘটনাবলী
গত অনৈক্য এবং হিতবাদীর সম্পাদকের পদে ইস্তফা। ন্যাশনাল স্কুলে জাতীয় অধ্যাপকের কার্য্যভার গ্রহণ।	বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রেপ্তার বরণ। নিউজ পেপারস অ্যাক্ট জারি। Criminal Law Amendment Act of 1908 দ্বারা 'অনুশীলন সমিতি' বে-আইনী ঘোষিত।
	১৯০৯ 'মর্লি-মিন্‌টো রিফর্ম'।
১৯১০ 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?' এর প্রকাশ 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষণা।	১৯১০ 'ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট' জারি। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত।
	১৯১১ সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত দর্শন। বঙ্গ ভঙ্গ সংস্কার। নয়া দিল্লীর ভিত্তি পত্তন। বঙ্গ ভঙ্গ রদ।
১৯১২ ২৩ শে নভেম্বর দেওঘরের 'করো' গ্রামে ৪৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ।	১৯১২ দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর। সর্ব প্রথম বিমানে ডাক বহন।

পরিশিষ্ট—৩

ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিবৃত্ত ও তথ্যবৈচিত্র্যের রূপরেখা বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ তালিকা

অ

অগ্নিদিনের কথা	সতীশ পাকড়াশী।
অগ্নিযুগ	শৈলেশ দে সম্পাদিত।
অগ্নিযুগের নায়ক	অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ।
অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ	হেমন্ত চাকী।
অগ্নিযুগের ফেরারী	ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।
অনুশীলন সমিতির ইতিহাস	জীবনতারা হালদার।
অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস	ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।
অবিস্মরণীয়	গঙ্গানারায়ণ চন্দ।
অমৃত পথ যাত্রী	সুবোধ ঘোষ।
অরুণ বহ্নি	শান্তি দাশ।
অসি বনাম মসী	সুনীত ঘোষ।
অশ্বিনীকুমার দত্ত	সুরেন্দ্রনাথ সেন।

আ

আগষ্ট বিপ্লব	তারিণীশংকর চক্রবর্তী।
আজাদ হিন্দ ফৌজ	ঐ
আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী	শাহওয়াজ খান।
আজাদ হিন্দের অঙ্কুর	বিজয়রত্ন মজুমদার।
আজিকার ভারত	রজনীপাম দত্ত।
আঠারো শ' সাতান্নের বিদ্রোহ	অশোক মেটা।
আত্মকথা	রাজেন্দ্র প্রসাদ (অনু: প্রিয়রঞ্জন সেন)
আত্মকাহিনী	বারীন্দ্র কুমার ঘোষ।
আত্মচরিত	কৃষ্ণ কুমার মিত্র।
আত্মজীবনী	পুলিন বিহারী দাশ।
আন্দামানে দশ বৎসর	মদনমোহন ভৌমিক।

জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত	যোগেশচন্দ্র বাগল।
জীবন ব্রত ও গান্ধীবাদ	সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।
জেলখানা—কারগার	নিকুঞ্জ সেন
জেলে ত্রিশ বছর	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

ঝ

ঝাঁসীর রাণী	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

দ

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ	অনুঃ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।
দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
দ্বীপান্তরের কথা	বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
দেশ নায়ক শরৎচন্দ্র	সুধীরচন্দ্র রায়
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন	সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	সুকুমাররঞ্জন দাস

ন

নবযুগের বাংলা	বিপিনচন্দ্র পাল
নমামি	জিতেশ লাহিড়ী
নয়া ভারতের ভিত্তি	রেজাউল করীম।
নির্বাসিতের আত্মকথা	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবেদিতা	সরলাবালা দাসী
নিঃসঙ্গ	সতীশচন্দ্র দে
নেতাজী ও আজাদহিন্দ ফৌজ	জ্যোতিপ্রসাদ বসু
নেতাজী ও কুইসলিং প্রসঙ্গ	প্রকাশ ভট্টাচার্য্য
নেতাজীর জীবনবাদ	অনিল রায়
নেতাজীর বাণী	
নেতাজীর মত ও পথ	সমর গুহ
নোয়াখালিতে গান্ধীজী	অতুল্য ঘোষ
নোয়াখালির পটভূমিকায়	কানাই বসু

প

পঞ্চাশের মন্বন্তর	শ্যামাপ্রসাদ মুখো:
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়	বীণাপাণি দাস
পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রাম	সুধীরচন্দ্র মৈত্র
প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী (স্বামী)	নিশিকান্ত গঙ্গো:।
পি. মিত্র	ক্ষীরোদকুমার দত্ত।
পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ	অনিল বরণ রায়।

ফ

ফাঁসির সত্যেন	ব্রজবিহারী বর্মণ।

ব

বকসা ক্যাম্প	অমলেন্দু দাশগুপ্ত।
বন্দী জীবন	শচীন্দ্র নাথ সান্যাল।
বরদৌলি সত্যাগ্রহ	সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।
বহির্ভারতে ভারতের মুক্তি প্রয়াস	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্র চেষ্টা	ক্ষীরোদ কুমার দত্ত।
বাংলার অগ্নিযুগ	ঐ
বাংলা দেশের ইতিহাস	রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলার নবজাগৃতি	বিনয় ঘোষ
বাংলার নবযুগ	মোহিতলাল মজুমদার
বাংলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা	হেমেন্দ্র কানুনগো
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনী কিশোর গুহ
বাঘা যতীন	বিমান চট্টোপাধ্যায়
বাঘা যতীন	কালীকান্ত মৈত্র।
বারীন্দ্রের আত্মকথা	বারীন্দ্র কুমার ঘোষ
বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী	ঐ
বিদ্রোহী ভারত	নীহার রঞ্জন গুপ্ত
বিপ্লব কাহিনী	প্রভাস লাহিড়ী

ভ

ভারত ভাগের অপরাধী যারা	রামমোহন লোহিয়া
ভারত সন্ধানে	জওহরলাল নেহরু
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ	প্রমোদ সেনগুপ্ত
ভারতে জাতীয় আন্দোলন	হীরেন মুখোপাধ্যায়
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব	ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	সুপ্রকাশ রায়
ভারতের জাতীয় আন্দোলন	প্রভাত মুখোপাধ্যায়
ভারতের জাতীয়তা আন্তর্জাতিক ও রবীন্দ্রনাথ	নেপাল মজুমদার।
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস	হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
ভারতের বিপ্লব কাহিনী	ঐ
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	সুপ্রকাশ রায়
ভারতের মুক্তি সংগ্রাম	অনাদি নাথ পাল
ভারতের মুক্তি সন্ধানী	যোগেশচন্দ্র বাগল
ভারতের সংবাদপত্র	তারাপদ পাল
ভারতের সাধক	গোপাল ভৌমিক
ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া	প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লব বাদ	উমা মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়
ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস	সুকুমার রায়
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস	নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ম

মন্ত্রী মিশন ও ভারতবর্ষ	জ্যোতিষচন্দ্র রায়
মহাত্মা অশ্বিনী কুমার	শরৎ কুমার রায়
মহাত্মা শিশিরকুমার	
মহাজাতি গঠন পথে	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু: অমরেন্দ্রনাথ মুখো:)

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী	ক্ষিতীশ দাস
মহামানব মহাত্মা	বিজয় ভূষণ দাশগুপ্ত
মহামানব মহাত্মা	কনক ও সুশীল বন্দ্যোঃ
মানবেন্দ্র নাথ	স্বদেশ রঞ্জন দাস
মানুষ চিত্তরঞ্জন	অর্পণা দেবী
মাষ্টার দা	আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত
মুক্তির নূতন পথ	আশুতোষ দাশগুপ্ত
মুক্তি সংগ্রাম	রবীন্দ্র কুমার বসু
মুক্তি সংগ্রাম	সুভাষ চন্দ্র বসু
মুক্তির সন্ধানে ভারত	যোগেশচন্দ্র বাগল
মুক্তি সাধনায় চন্দননগর	হরিহর শেঠ
মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই	সুধীরকুমার মিত্র
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল চাকী	ঐ
মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন	শান্তি সুধা ঘোষ
মেদিনীপুরে বোমা পিস্তল	অতুলচন্দ্র বসু
মেদিনীপুরে স্বাধীনতা সংগ্রাম	বসন্ত কুমার দাস

য

যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়	কালীপদ বিশ্বাস

র

রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রক্তের অক্ষরে	কমলা দাশগুপ্ত।
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ	মণি বাগচি।
রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়	শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লব	চিন্মোহন সেহানবীশ।

শ

শত শহীদের রক্তে	অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ।
শহীদ স্মরণে	নরেন্দ্রনাথ গুহ রায়।
শহীদ স্বতীশ	শিশির গঙ্গোপাধ্যায়।

স